NEHRU BAL PUSTAKALAYA

পরিবেশ দূষণ

এন. শেষগিরি





নেহরু বাল পুস্তকালয়

পরিবেশ দূষণ

এন. শেষগিরি

অনুবাদ :

ডঃ গুরুদাস ভট্টাচার্য

ছবি : এন বি টি ওয়ার্কশপ, নয়াদিল্লি, 1982



ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া

1989 (শক 1911)

মূল্য : 6.50 টাকা

Pollution *(Bengali)*

নির্দেশক, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, এ-5, গ্রীন পার্ক, নয়াদিল্লি-110016 কর্তৃক প্রকাশিত।

ছবি : (পৃষ্ঠা অনুযায়ী)

মিকি প্যাটেল 32-33

পূর্ণেন্দু পত্রী 1

সৈয়দা ইকবাল বানো 4-5

অমিতাভ সেনগুপ্ত 9, 10, 14-15, 34-35, 40-41, 54-55

দীপক বগ্গা 11, 18-19, 26-27, 36-37, 62

শুদ্ধসত্ব বসু 12-13, 20-21, 25, 29, 46-47, 50-51,
52, 56, 58-59, 60-61, 64, তৃতীয় প্রচ্ছদ

মনোজ মিস্ত্রী 30-31

বিশ্বজিৎ লাহিড়ী 42-43, 49

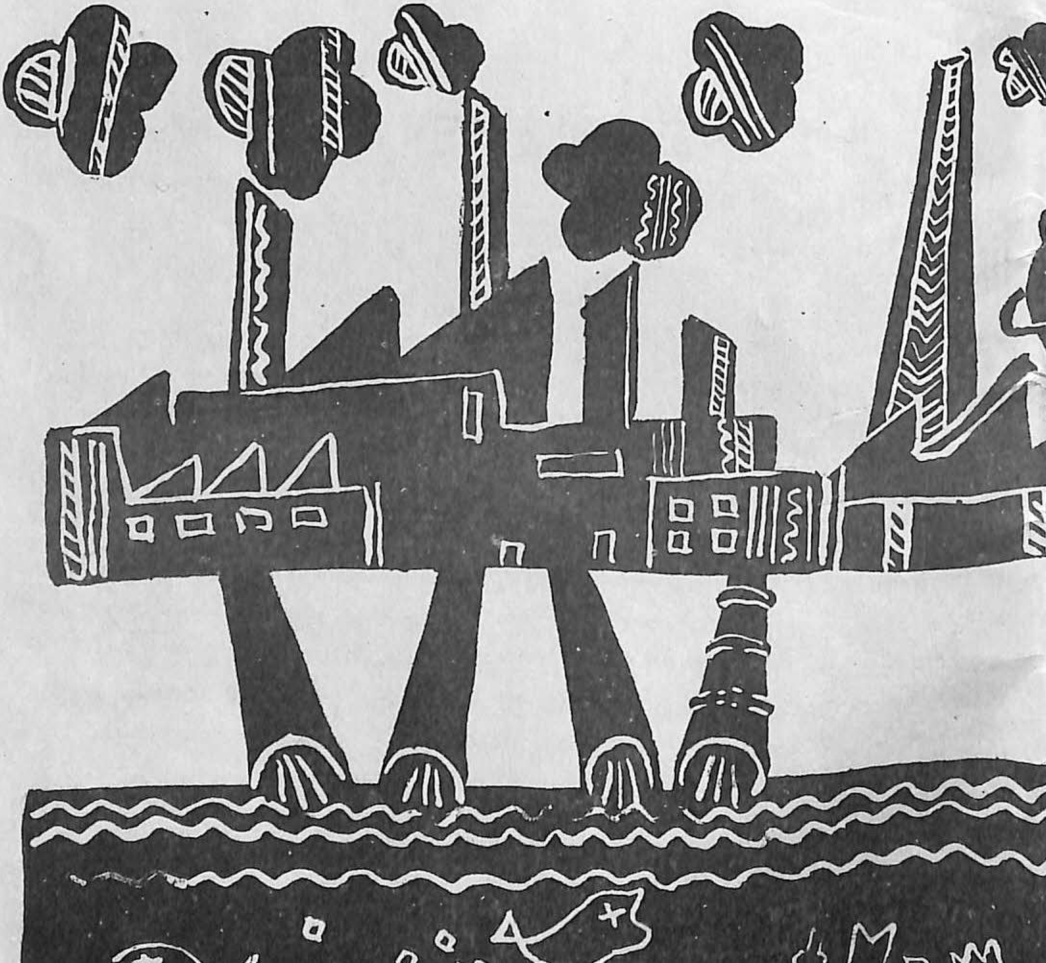
ছবির সংগঠক :

জয়া দয়াল 6-7, 16, প্রচ্ছদ

যন্ত্রযুগ না দূষণযুগ ?

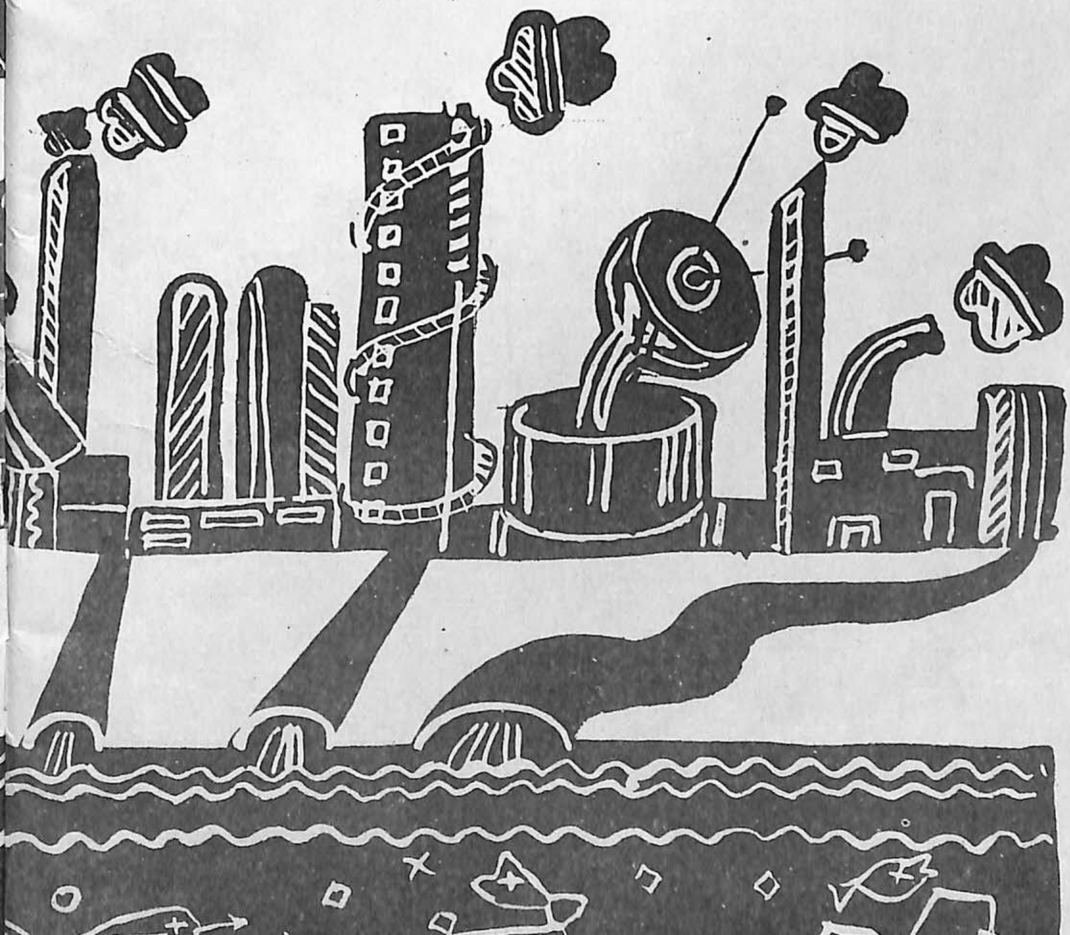
হাজার হাজার বছর ধরে ভারতবাসীরা গঙ্গানদীকে পবিত্রজ্ঞানে পূজা করে এসেছে। এর জলকে একদা এতো শুদ্ধ বলে মনে করা হত যে আমাদের পূর্বপুরুষরা বড়-বড় ঘড়ায় গঙ্গাজল মুখ বন্ধ করে রেখে দিতেন। যতো বছর পরেই হোক, পরিবারের কারও মৃত্যু-সময় উপস্থিত হলে ঘড়ার সীলকরা মুখ খুলে তা থেকে কয়েক ফোঁটা 'গঙ্গাজল' তার মুখে ঢেলে দেওয়া হত। আর আজ, সেই নদীর কোনো-কোনো ঘাটের জল পান করা মানেই মৃত্যু! কারণ, গঙ্গা এখন আর আগের মতো পরিশুদ্ধা নয়। গত কয়েক দশক ধরে হিমালয় থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত নদীটির দীর্ঘ গতিপথের এ তীরে-ও তীরে সংখ্যাহীন কারখানা বসে গেছে এবং তাদের অনেকগুলি থেকে বিষাক্ত আবর্জনা এসে পড়ছে এই পবিত্র নদীতে। দাক্ষিণাত্যের আরেক পবিত্র নদী কাবেরীরও একই হাল। একের পর এক আমাদের নদীগুলি হয়ে উঠছে কলকারখানাজাত বিষাক্ত রাসায়নিক, কৃষি-আবর্জনা, কীটনাশক ওষুধ, এমনকি অ্যাসিডেরও বেওয়ারিশ আধার।

নদীর চেয়েও শোচনীয় অবস্থা আমাদের হ্রদ ও পুকুরগুলোর। শ্রীনগরের বিখ্যাত ডাল ও নাগিন হ্রদ — যা নাকি 'টুরিস্টদের স্বর্গ' — ঝাঁঝিতে বুঁজে যেতে বসেছে। কয়েক দশক আগেও এরকম ছিল না। এর জন্য দায়ী টুরিস্টরাই, যারা **চর্ব-চুষ্য** খেয়ে খোসা-ছিবড়ে-পাতা ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয় হ্রদের জলে। এহেন উপাদেয় ভুরিভোজে ঝাঁঝির দল বেড়ে গেছে হু-হু করে। এর চেয়েও খারাপ অবস্থা মণিপুরের লোকটক হ্রদের; তার জলে আগাছা এতো ঘন যে তার ওপর দিয়ে দিব্যি হেঁটে যাওয়া যায়। ওড়িশার চিলকা এবং আরও অনেক হ্রদই একইভাবে বিপন্ন।



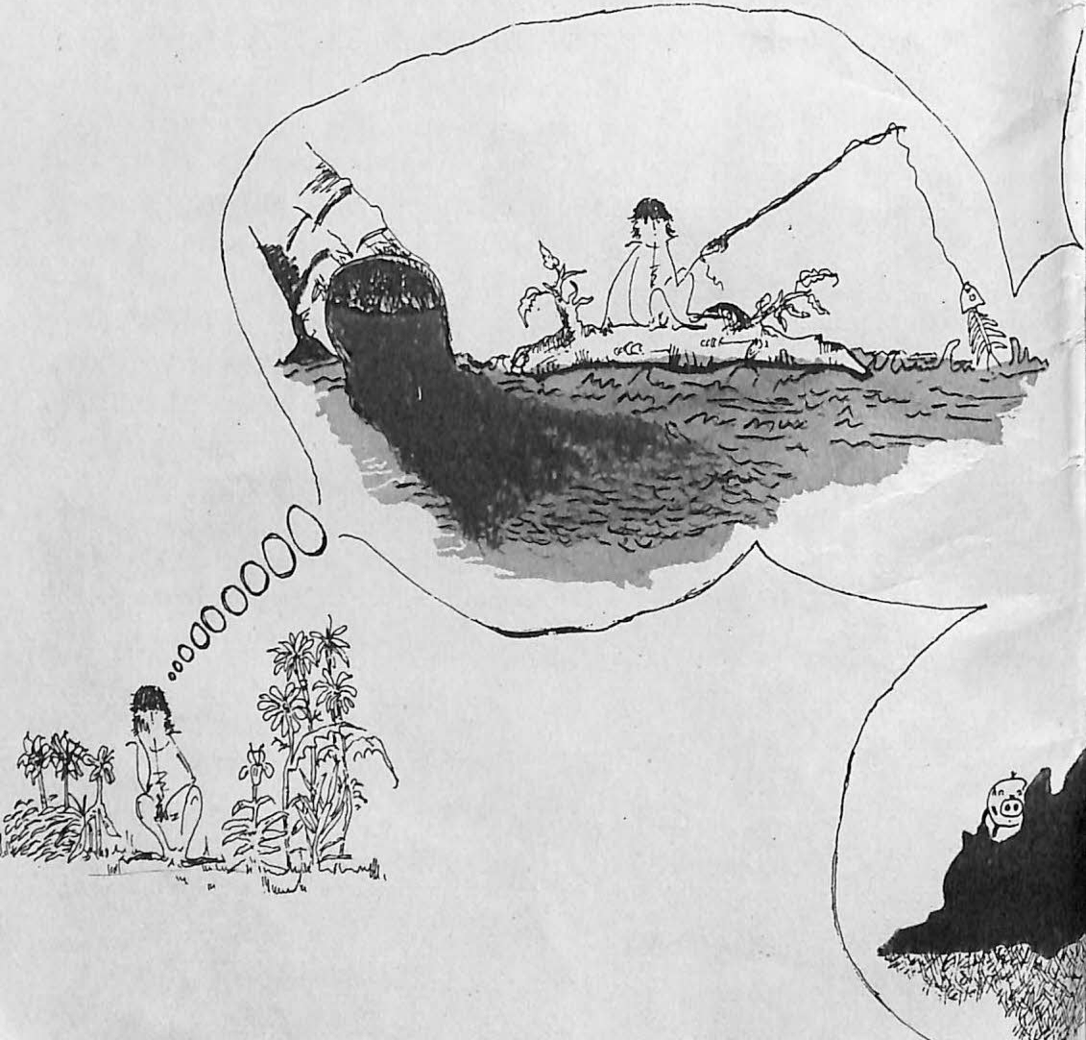
সমুদ্রও রেহাই পায় নি। গোটা পৃথিবীতে যতো তেল উৎপন্ন হয় তার বেশির ভাগটাই চালান যায় সমুদ্রপথে। তৈলবাহী ট্যাংকার এবং সাধারণ জাহাজে সেসব নিয়ে যাওয়া হয়। এর এক হাজারের এক ভাগ হয় ছল্‌কে পড়ে অথবা ফুটো দিয়ে চুঁইয়ে যায় নীচে। বস্তুত, ভারতের চারদিকের সমুদ্রে বছরে 1,000,000 টনেরও বেশি তেল এইভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এর অনেকখানিই সমুদ্রে থেকে যায় এবং বছর-বছর জমতেই থাকে — কেননা, জলের মতো তেল সহজে বাষ্প হয়ে উড়ে যায় না।

গঙ্গা নদী, নাগিন হ্রদ, চারপাশের সমুদ্রে যা ঘটছে, তা শুধু ভারত নয়, গোটা



হেক্টর বৃক্ষ-ভূমিকে একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছে।

ঠিক কথা, আমরা প্রবেশ করেছি মহান যন্ত্র-যুগে। কিন্তু চারপাশের পরিবেশকে যদি আমরা যথোচিত খাতির না করি, তাহলে এও পরিণত হতে পারে দূষিত অন্ধকার-যুগে।





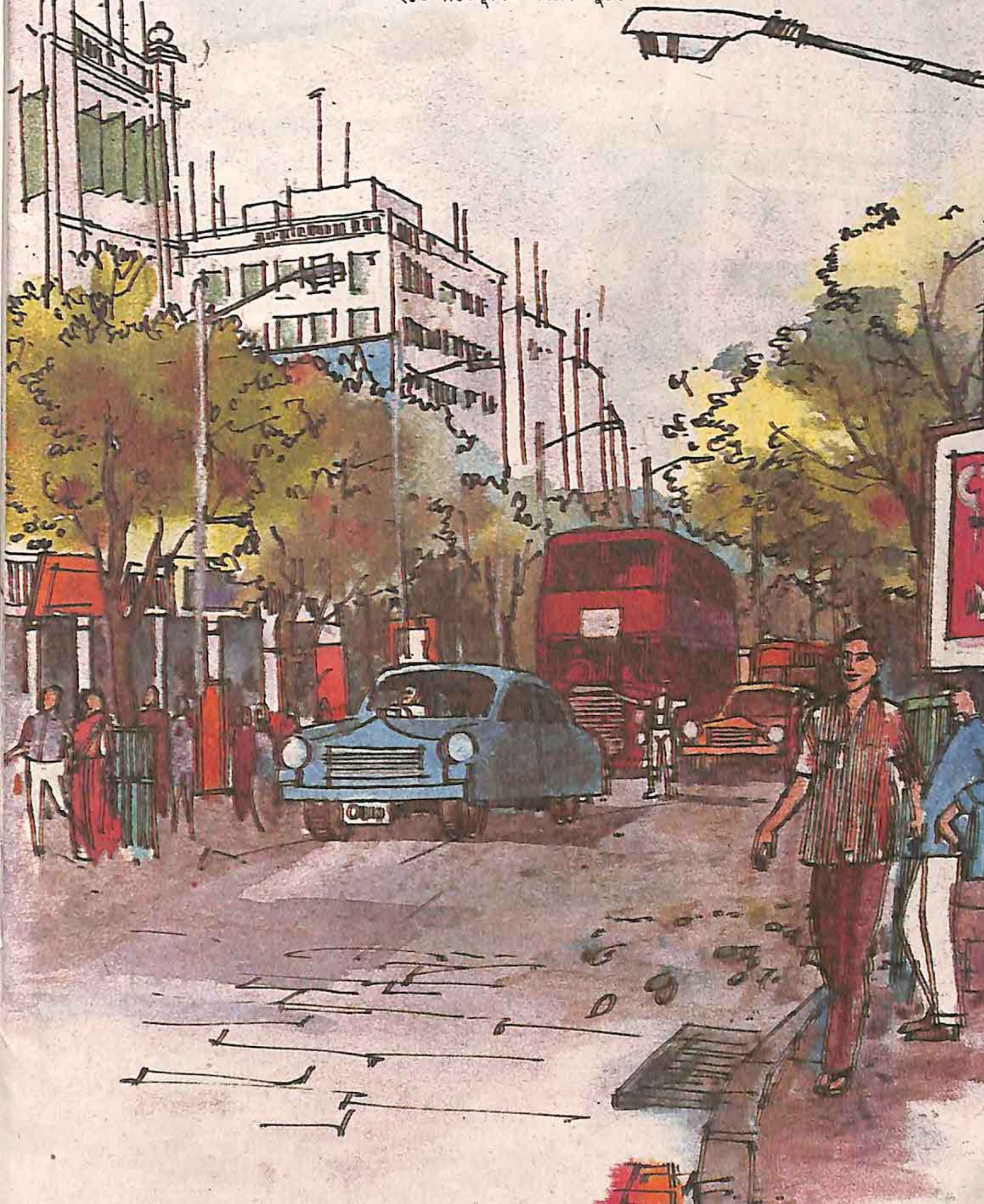
রাসায়নিক উপাদান আছে, যার ফলে ভারতের অন্য যেকোন শহর বা নগরের লোকেদের চেয়ে বোম্বাইবাসীরা দশভাগ বেশি আক্রান্ত হয় সর্দি, কাশি, মাথাধরা, হাঁপানি, ব্রংকাইটিশ প্রভৃতি রোগে। আমাদের স্বাস্থ্যের সবচেয়ে বড় শত্রু বায়ু-দূষণ, শুধু আজ নয় আগামীকালেরও। কেবল-যে শূন্যে ধোঁয়া-উদ্গীরণকারী কারখানার চিমনীগুলোই বাতাসকে দূষিত করে তাই নয়; আর-এক বড় আসামী হচ্ছে আধুনিক যানবাহন — মোটর, লরী, ট্রাক, বাস ইত্যাদি। এদের নির্গমী-নল থেকে ধোঁয়া বেরোতে তো সবাই দেখ; কিন্তু জানো কি — বোম্বাই, কলকাতা, দিল্লী, মাদ্রাজ এবং বাঙ্গালোর — শুধু এই পাঁচটা শহরেরই তামাম গাড়িগুলো মিলে দৈনিক 1,000,000 কিলোগ্রামেরও বেশি ধোঁয়া উগ্‌রে দেয় বাতাসে যা আমরা নিঃশ্বাসে নিই? 1,000,000 কিলোগ্রাম মানে কতোটা ধোঁয়া, বলতে পারো? একটা মোটামুটি ধারণা দিই — একশোটা ডিজেল-লরী যদি একসঙ্গে লাগাতার পাঁচ মিনিট ধোঁয়া ছাড়তে থাকে, তাহলে তাদের মোট ওজন হবে মাত্র এক কিলোগ্রাম! তাহলে, এর দশলক্ষ গুণ বেশি দূষিত বায়ু তোমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে কতোটা ক্ষতিকারক হতে পারে, বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই।

মানব সভ্যতার বয়স হবে কয়েক হাজার বছর। তার মধ্যে, মাত্র গত কয়েক দশক ধরেই মানুষ এতো জঞ্জাল আর লোহালক্কড়, পঁচাগলা তথা ভাঙ্গাচোরা জিনিসপত্র ফেলা শুরু করেছে, যার ফলে তার স্বাস্থ্যই এখন বিপন্ন হয়ে উঠেছে। তরিতরকারির উচ্ছিষ্ট, খালি পলিথিনের ব্যাগ, কাগজ, ছেঁড়া ন্যাক্‌ড়া, হরেকরকম আজেবাজে টুকরো-টাকরা — সব মিলিয়ে দৈনিক অন্তত আধ বালতি জঞ্জাল পড়ে আমাদের প্রায় প্রতিটি গৃহস্থবাড়ি থেকে। ভারতে পরিবারের সংখ্যা হারে 100,000,000-রও কিছু বেশি। মোট জঞ্জালের বালতির সংখ্যা তাহলে দাঁড়ায় দৈনিক 50,000,000 মতো। বছরে কম-বেশি 20,000,000,000 বালতি! সব গিয়ে জমা হয় ধাবায়। ধাবা যদি না থাকে, তবে যেখানে সুবিধে, লোকে জঞ্জাল ফেলে, এবং পড়েই থাকে সেখানে। ভেবে দেখ, চারপাশে কী বিপুল পরিমাণ ময়লা আমরা ছড়িয়ে চলেছি!

অতএব দেখা যাচ্ছে, পদার্থের যে তিন অবস্থার কথা আমরা জানি — কঠিন, তরল ও বায়বীয় বা বাষ্পীয় — তিন ক্ষেত্রেই দূষণের অভিযান শুরু হয়ে গেছে। এছাড়া, আরও নতুন নতুন দূষণেরও জন্ম হচ্ছে। সর্বাধুনিক হল 'শব্দ-দূষণ'। তোমাদের মধ্যে যারা শহরে থাকো, কাছাকাছি কোন গ্রামে একবার যেও, চারপাশকে মনে হবে খুব শান্ত। যারা চিরকাল শহরেই আছো, তাদের কাছে এতোটা চুপচাপ কেমন-যেন অস্বাভাবিক লাগবে। যারা গ্রামেই থাকো, জনবহুল শহরে একবার চলো এসো — যত্রতত্র শব্দের অবিরাম ঠোকাঠুকিতে কান তোমাদের ঝালাপালা হয়ে যাবে। এমন উল্টোপাল্টা হওয়ার কারণ — একজায়গায় শব্দরা চিৎকার করে, অন্য জায়গায় শব্দরা নেইই। এবং অনবরত উঁচু আওয়াজ জখম করে দেয় আমাদের স্নায়ুকে।

শুধু মানুষই নয়, গাছপালা-জীবজন্তুও দূষণের শিকার। বাস, লরী, মোটরগাড়ী থেকে পেট্রল বা ডিজেলের যে ধোঁয়া বেরোয়, তার মধ্যে এমন কতকগুলো রাসায়নিক উপাদান থাকে যা সূর্যের আলোর ছোঁয়ায় পরিণত হয় নানা বিষাক্ত পদার্থে। এইসব বিষ তামাক, আলু, টমেটো, নানান শাকসবজী, শস্য ও মটরশুঁটি এবং ফুলের মতো নাজুক গাছপালাকে বিষিয়ে দিতে পারে, দেয়ও। প্লাসটিক বানানোর প্রয়োজনে রাসায়নিক উপাদান তৈরি হয় যেসব কারখানায়, সেখানকার ধোঁয়া গোলাপ ও কার্পাস চারার সমূহ ক্ষতি করে। ধাতুপিণ্ড গলানোর কারখানায় জাত 'সিলভার-ডাইঅকসাইড' লক্ষ লক্ষ

‘পরিবেশকে যদি খাতির না করি, তাহলে এও পরিণত
হতে পারে দূষিত অন্ধকার যুগে’



'আমাদের এই পৃথিবীকে আমরাই ধীরে ধীরে বিষিয়ে তুলছি'



হেক্টর বৃক্ষ-ভূমিকে একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছে।

ঠিক কথা, আমরা প্রবেশ করেছি মহান যন্ত্র-যুগে। কিন্তু চারপাশের পরিবেশকে যদি আমরা যথোচিত খাতির না করি, তাহলে এও পরিণত হতে পারে দূষিত অন্ধকার-যুগে।



নর্দমা বাড়ছেই

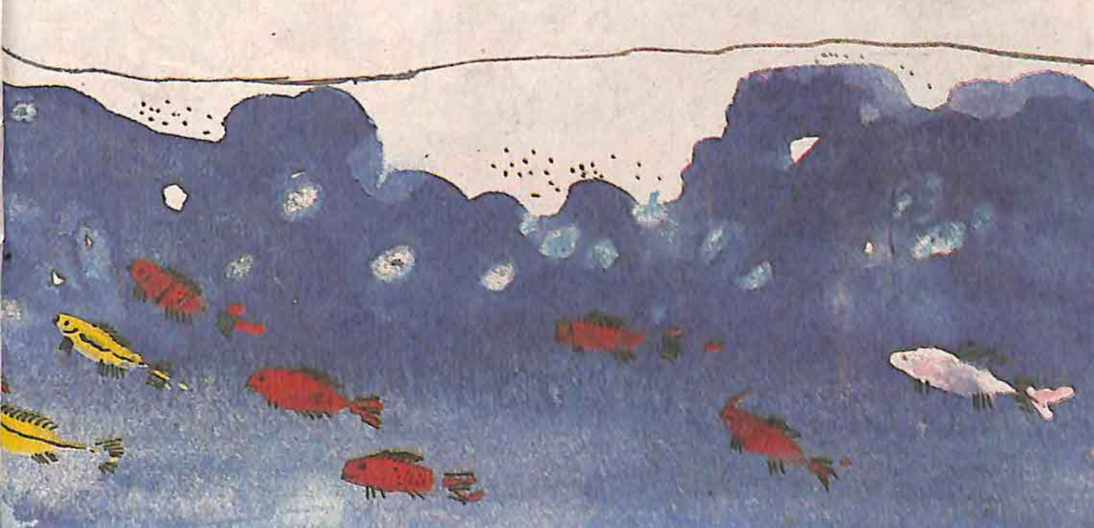
জলকে আমরা খুব হেলাফেলার জিনিস মনে করি। নদী থেকে, কূয়ো থেকে, কল খুললেই, যতো ইচ্ছে জল পেতে পারি। তাই বলে জল কিন্তু মোটেই এতো সস্তা নয়। ইতিহাসের সে রূপকার। ধারে-কাছে জল নেই এমন জায়গায়, কখনও কোনো সভ্যতা গড়ে ওঠে নি, উঠতে পারে নি। সিন্ধু সভ্যতা সম্ভব হয়েছিল সিন্ধু নদের তীরেই। গঙ্গা ও কাবেরী নদীর অববাহিকায় মাথা তুলেছিল প্রাচীন ভারতের রাজ-রাজত্ব। প্রাণদায়িনী নদী তাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিসের অধিকার নিয়ে অনেক লড়াই হয়ে গেছে পুরাকালের মেসোপটেমিয়ায়। অন্যদিকে, জল যখন শুকিয়ে গেছে বা ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে উঠেছে, সভ্যতাও মরে গেছে তার সাথে-সাথে।

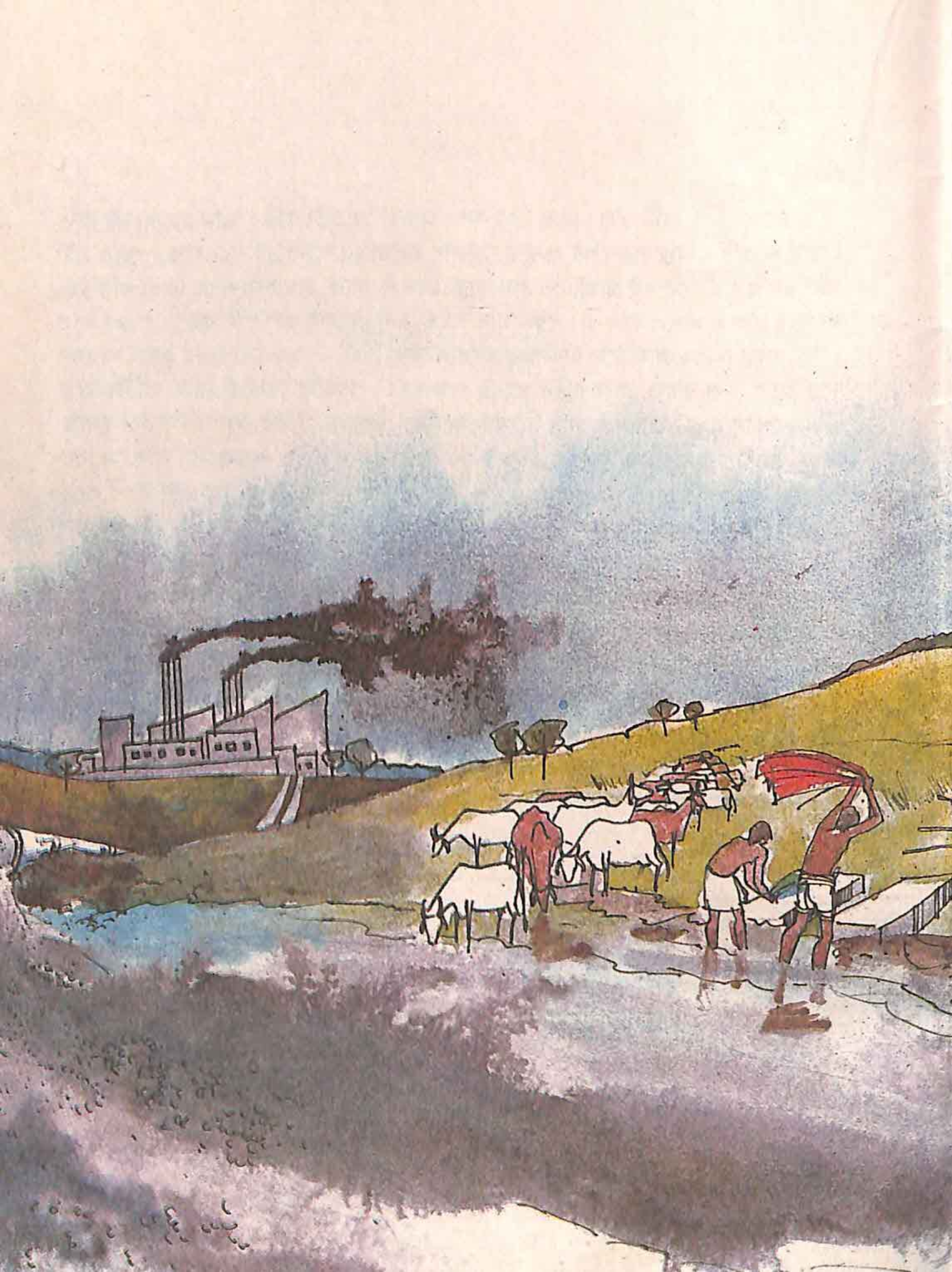


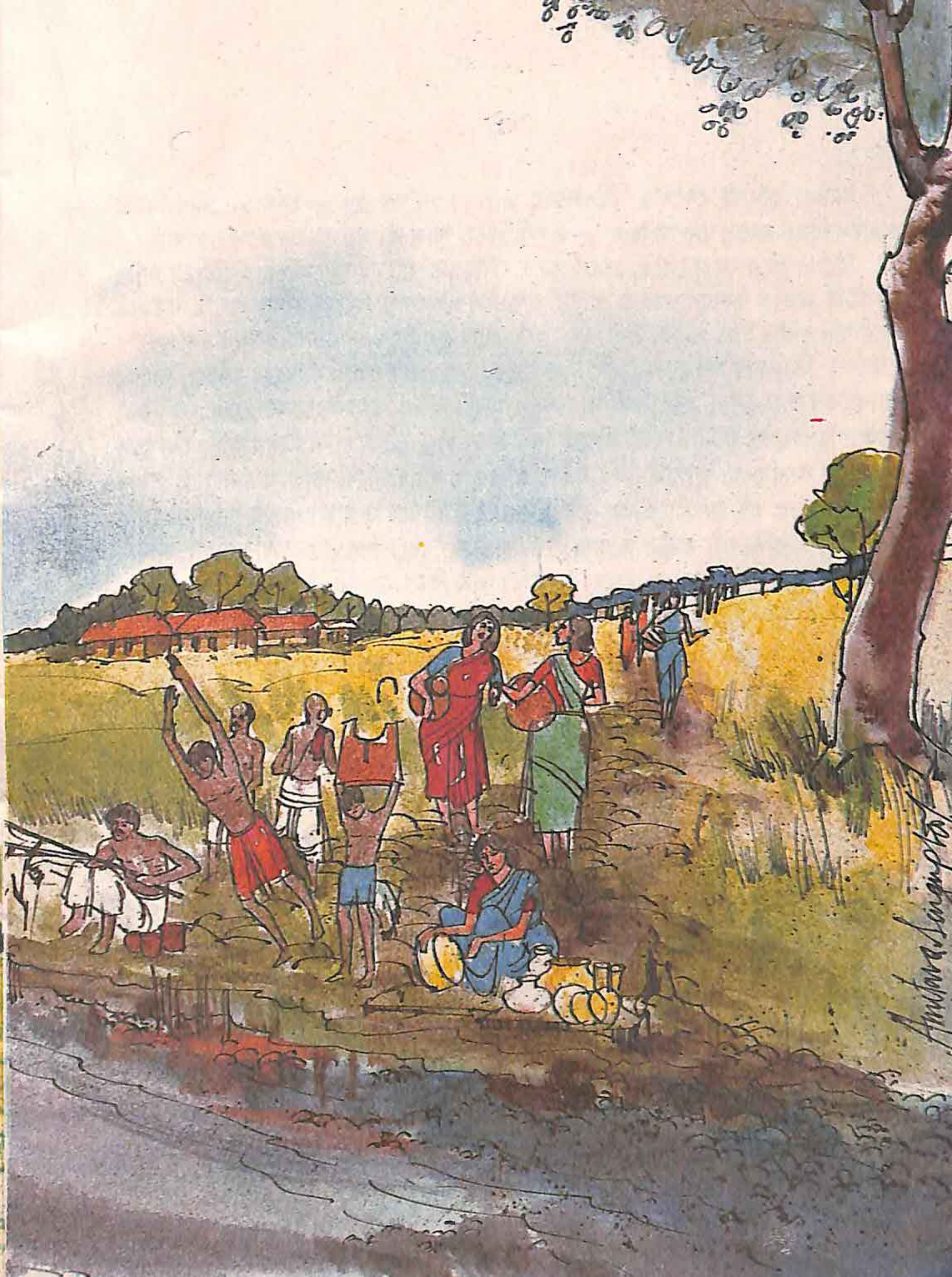
এতোখানিই দামী জল ! কিন্তু তার কদর আমরা কতোটা করি ? আমরা জল নষ্ট করি, নোংরাও করি। অন্ধ্র প্রদেশের গুনটুর জেলার মলপ্পাডুর ঘটনাটাই ধরা যাক। ছোট্ট নদী চপ্পাডিবাগুর তীরের এই গ্রামটিতে বাস করে একদল লোক, লম্বাদাস নামে তারা পরিচিত, সংখ্যায় এক হাজারও হবে না। গরু-মোষ আছে, নদী থেকেই জল পান করে। 1977 সাল নাগাদ শান্ত-নিরীহ গ্রামটিতে এক অদ্ভুত রোগ দেখা দিল — গরু-মোষদের হঠাৎ পাতলা দাস্ত হতে শুরু করল, কয়েকদিন পরেই পক্ষাঘাত। দেখতে দেখতে রোগ জটিল হয়ে উঠল, শেষে মৃত্যু। কারণ খুঁজতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা দেখলেন, নদীর জল দূষিত হয়ে গেছে সীসে-জাতীয় রাসায়নিক উপাদানে, সেই জল পেটে গিয়ে মরছে পশুগুলো; আর সে বিষ আসছে কাছাকাছি একটা কারখানা থেকে। অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার তখুনি আদেশ জারি করে কারখানাটি বন্ধ করে দেন।

এইসব বেপরোয়া কারখানাওয়ালারা নদী-হ্রদের জলকে কিভাবে বিষাক্ত করে দেয়, মলপ্পাডুর বিয়োগান্ত ঘটনা তারই একটা জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত। এইভাবেই ওরা নদী-নালা-হ্রদে ঢেলে দেয় কলকারখানার আবর্জনা, যার মধ্যে থাকে সাংঘাতিক সব রাসায়নিক পদার্থ যা গরু-মোষ-ছাগল এমনকি মানুষকেও মেরে ফেলতে পারে।

কাশীর একটা বড় তৈল-শোধনাগার টন-টন আবর্জনা ফেলে পবিত্র নদী গঙ্গায়। তার সঙ্গে যোগ দাও 10,000 লিটারেরও বেশি নর্দমার ময়লা, পাঁক। স্বয়ং গঙ্গারই যখন এই হাল, তখন অন্য যেসব নদীকে কম পবিত্র বলে মনে করা হয়, তাদের কপালে যে কী ঘটে, সহজেই অনুমান করতে পারো।



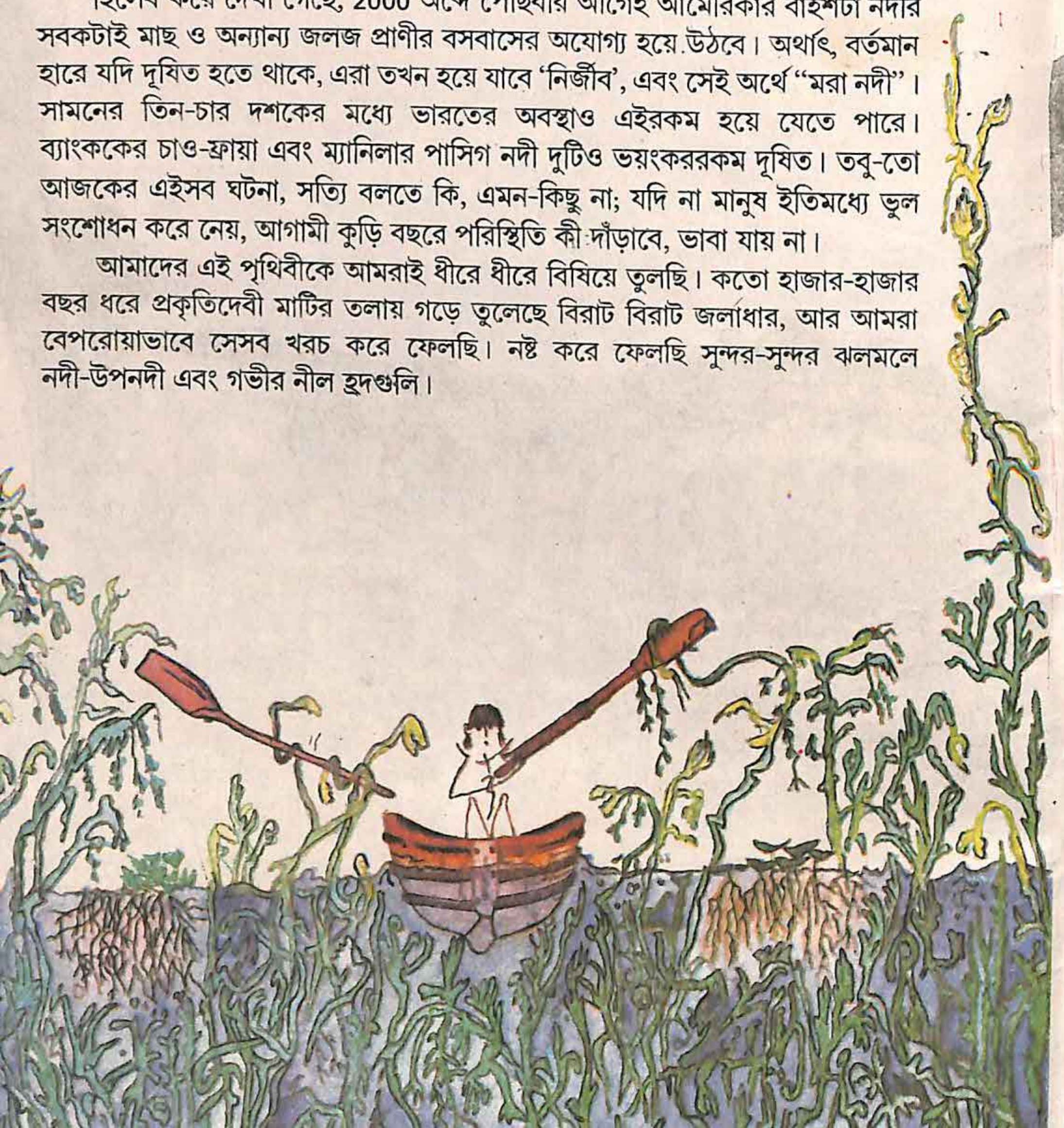




আমরা আগেই দেখেছি, শ্রীনগরের ডাল ও নাগিন হ্রদ — যেখানে নৌকাবিহার একদিন দারুণ মজার ব্যাপার ছিল — জলঝাঁঝিতে আজ তাদের দমবন্ধ হবার জোগাড়।

হিসেব করে দেখা গেছে, 2000 অব্দে পৌঁছবার আগেই আমেরিকার বাইশটা নদীর সবকটাই মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠবে। অর্থাৎ, বর্তমান হারে যদি দূষিত হতে থাকে, এরা তখন হয়ে যাবে 'নির্জীব', এবং সেই অর্থে "মরা নদী"। সামনের তিন-চার দশকের মধ্যে ভারতের অবস্থাও এইরকম হয়ে যেতে পারে। ব্যাংককের চাও-ফ্রায়া এবং ম্যানিলার পাসিগ নদী দুটিও ভয়ংকররকম দূষিত। তবু-তো আজকের এইসব ঘটনা, সত্যি বলতে কি, এমন-কিছু না; যদি না মানুষ ইতিমধ্যে ভুল সংশোধন করে নেয়, আগামী কুড়ি বছরে পরিস্থিতি কী দাঁড়াবে, ভাবা যায় না।

আমাদের এই পৃথিবীকে আমরাই ধীরে ধীরে বিষিয়ে তুলছি। কতো হাজার-হাজার বছর ধরে প্রকৃতিদেবী মাটির তলায় গড়ে তুলেছে বিরাট বিরাট জলাধার, আর আমরা বেপরোয়াভাবে সেসব খরচ করে ফেলছি। নষ্ট করে ফেলছি সুন্দর-সুন্দর ঝলমলে নদী-উপনদী এবং গভীর নীল হ্রদগুলি।



সমুদ্র-প্রমাণ ভুল

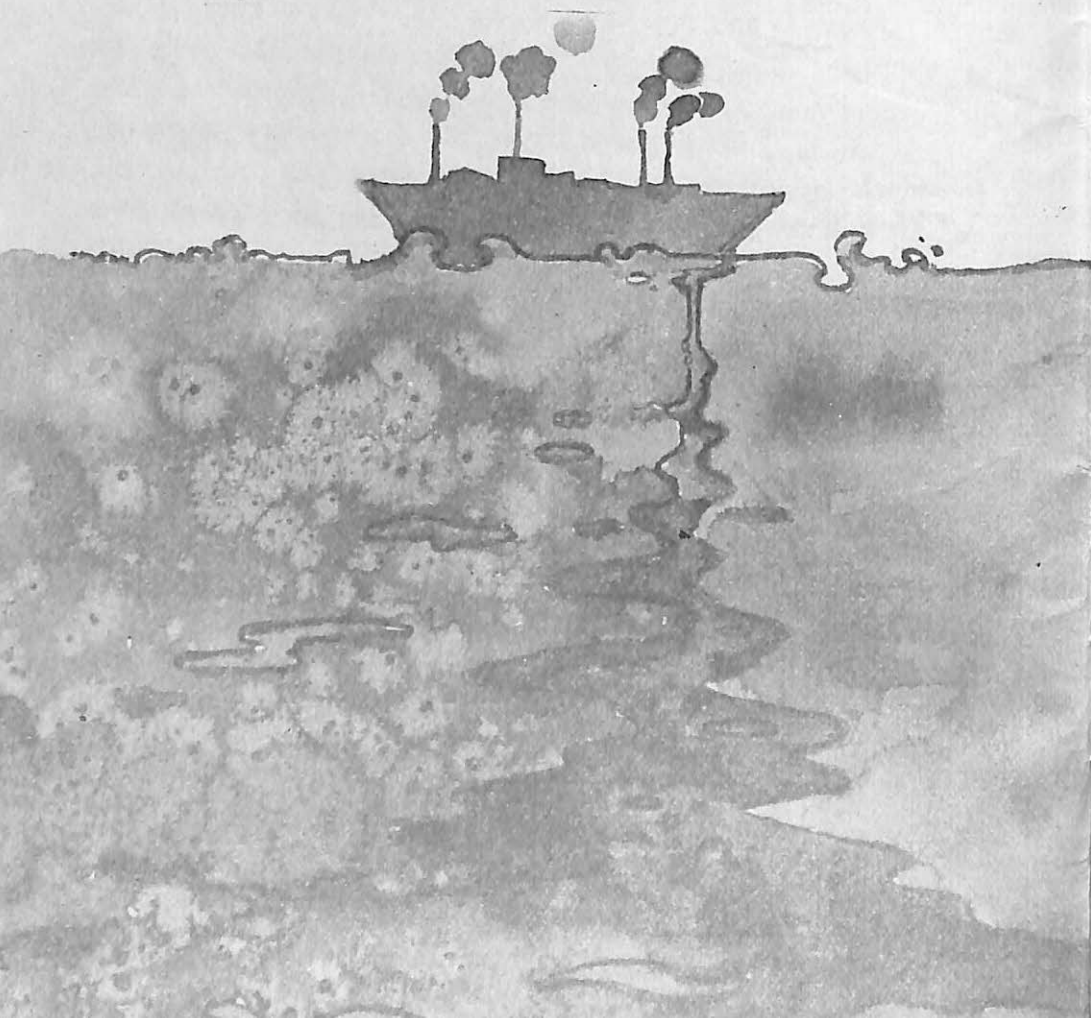
আমরা ভাবি : জল অফুরান। নদী আছে, স্রোতস্বিনী আছে, সবার ওপর রয়েছে আমাদের সাত সমুদ্দুর। কিন্তু একটা কথা আমরা মনে রাখিনা যে, পৃথিবীর লোকসংখ্যাও তো হু-হু করে বেড়ে যাচ্ছে। ফলে সমস্যাটা আসলে দাঁড়িয়েছে — জল ফুরিয়ে যাওয়ার নয় — যা জল আছে তার অনুপাতে মানুষ বেশি হয়ে যাচ্ছে কিনা, এই নিয়ে। কারণ, পৃথিবীর বুকে ব্যবহারযোগ্য জলের পরিমাণ নির্দিষ্ট, মাপাজোকা। যতো লোক বাড়ছে, জলের চাহিদাও বাড়ছে, ছাড়িয়ে যাচ্ছে তার জোগানের সীমা। 'অসীম সমুদ্র' যে সত্যিই অসীম নয়, একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে তা বোঝানো যেতে পারে।

সূর্যের তাপে সমুদ্রগর্ভ থেকে 340,000 কিউবিক কিলোমিটার জল বাষ্প হয়ে উঠে যায় প্রতি বছরে। এছাড়া, আরও 60,000 কিউবিক কিলোমিটার জল উবে যায় মাটির বুক থেকে। এরাই পরে আবার নেমে আসে শিলা, বৃষ্টি, বরফ হয়ে। এইভাবে, গড়পড়তা প্রায় 400,000 কিউবিক কিলোমিটার পরিমাণ জল দিন-রাত আকাশ আর পৃথিবীর মধ্যে যাতায়াত করতেই থাকে। একে বলা হয় 'জলাবর্ত'।

এইযে বিপুল পরিমাণ জল, এ-থেকে আমাদের মাথাপিছু বরাদ্দ কিন্তু দৈনিক 200 কিউবিক মিটারেরও কম। আর, শুধু মানুষই তো জলের ব্যবহার করে না; পশু, পাখি, পোকামাকড়দেরও রোজরোজ জল চাই। জল চাই প্রথমত পান করা তারপর ধোয়া-মাজার জন্যে, তারপরে চাষের মাঠে এবং শিল্প উদ্যোগে। আমরা যদি হিসেব করে জল খরচ না করি, অচিরেই বিপদে পড়ব।

তোমরা ভাবতে পারো — সমুদ্রের তলদেশ বিরাট জায়গা, অতএব ফেলো যতোখুশি মাল-মল-ময়লা। পৃথিবীতে 12,000,000,000 কিউবিক কিলোমিটার জল আছে ঠিকই, কিন্তু সমুদ্রকে এইভাবে দূষিত করার পরিণামও স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

ক্রমেই যেন আমরা বেশি-বেশি করে এবং রকম-রকম আবর্জনা সমুদ্রে ফেলে চলেছি। গড় হিসেবে, একজন ভারতীয়, এক বছরে, একটনের বেশি জ্বালানী এবং



দু'টনেরও বেশি খনিজ-বনজ পদার্থ ও খাদ্যশস্যাদি ব্যবহার করে থাকে। এ সবই লাগে কৃষি, শিল্প, সামাজিক কাজেকর্মে; দরকার ফুরিয়ে গেলে মাটিতেই পড়ে থাকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে, নানান অবস্থায় ও আকারে; এবং শেষ পর্যন্ত বেশির ভাগই গড়াতে-গড়াতে জড়ো হয় সমুদ্রে।

হিসেব করে দেখা গেছে, দুনিয়ার যতো নোংরা জঞ্জাল বছর-বছর সমুদ্র-যাত্রা করে, তার মধ্যে আমাদের, ভারতীয়দের অবদান : মাথাপিছু দৈনিক এক লিটার!

যেসব রাসায়নিক পদার্থ সমুদ্রের দুশমন, তাদের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন : 'ছাতাধরা' বন্ধ করার জন্যে যে হাজার হাজার টন বিষাক্ত পারা-মিশ্র স্প্রে করে দেওয়া হয় শূন্যে, সেখান থেকে তারা পড়ে নদীর বুকে, ভাসতে ভাসতে অবশেষে সেই সমুদ্রেই। বিশেষ জাতের পেট্রল ও অন্যবিধ জ্বালানীতে ব্যবহৃত সীসারও ওই একই গতি। মোটরগাড়ি-জাত সীসার শতকরা পঁচাত্তর ভাগই সমুদ্রে পৌঁছে যায়। অন্যদিকে, প্রায় এই পরিমাণ সীসা প্রকৃতিও জমা করতে থাকে। সমুদ্রের মাছ এবং অন্যান্য জলজ প্রাণীর ওপর পারা ও সীসার প্রতিক্রিয়া কী, আমরা এখনও পুরোপুরি জানি না। মূল



সমস্যা হল : পারা, সীসা, বিবিধ বিষাক্ত পদার্থ সমুদ্রে গিয়ে জমছে তো জমছেই, ওঠানো আর হচ্ছে না, বছরের পর বছর গাদা হয়ে থেকে যাচ্ছে। কয়েক দশক পরে সাগর-তলের জীব ও উদ্ভিদ জগতের ওপর তাদের প্রতিক্রিয়া তো হতেই পারে।



সমুদ্র-দূষণের আর এক বড় ভাগিদার পেট্রলিয়াম। এই পাতাটা পড়তে তোমাদের যতোটুকু সময় লাগবে, তারই মধ্যে 2,000 লিটারেরও বেশি তেল চল্‌কে পড়ে গিয়ে থাকবে সমুদ্রে। এইভাবে প্রত্যেক বছরই কয়েক লক্ষ টন পেট্রল ফুটোফাটা দিয়ে গড়িয়ে

পড়ে সাগরে-মহাসাগরে। ফলে, বালুকাবেলাগুলি ভরে উঠছে চ্যাট্‌চেটে কালো পাঁকে, ট্যুরিস্ট ব্যবসা মার খাচ্ছে। মরে যাচ্ছে হাজারে-হাজারে সমুদ্র-পাখি, ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে মাছের ভেড়ি।

বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন, সমুদ্রের আপন গর্ভে 1,000,000 টন মতো পেট্রলিয়াম-জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ তৈরি হয়। অর্থাৎ সমুদ্রকে আমরা যতোটা পেট্রল খাওয়াচ্ছি, প্রকৃতিও বানাচ্ছে ততোখানিই।

মানুষের তৈরি সমুদ্র-দূষণের অন্যতম আসামী ডি ডি টি। শস্যঘাতক কীট ও অন্যান্য উৎপাত দমনের জন্য রাসায়নিকের ব্যবহার দিনদিন বেড়েই যাচ্ছে। গাছের দেহে ডি ডি টি স্প্রে করলে পোকারা মরে, শস্য বেঁচে যায়। কিন্তু গাছ তো ডি ডি টি হজম করতে পারে না, বেশিটাই বৃষ্টিতে ধুয়ে যায়, তার অনেকখানিই পৌঁছে যায় সমুদ্রে। সেখানে আবার চলে একধরনের খেয়োখেয়ি ব্যাপার — এক প্রাণীকে খায় আরেক প্রাণী, তাকে খায় অন্য-আরেক প্রাণী — একে বলা হয় 'খাদ্য-শৃংখল'। এই শেকলের সবচেয়ে নীচের তলায় রয়েছে 'আল্‌জী' — শ্যাতলাজাতীয় এক-কোষী ক্ষুদে প্রাণ। ডি ডি টি এবং অন্য কীটনাশক ওষুধগুলো অতি পাজী বিষ, কিছুতেই গায়েব বা খতম হতে চায় না; সমুদ্রে পৌঁছে খাদ্য-শৃংখলটাকে ভেঙ্গে তো দেবেই, ওখানকার প্রাণ-ধারাকেও বিপন্ন করে তুলতে পারে। আজ পর্যন্ত পৃথিবী জুড়ে যতো ডি ডি টি প্রয়োগ করা হয়েছে, তার সবটাই বোধহয় এখনও জমা হয়ে আছে স্থলে, জলে, উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহে।

পৃথিবীর বুকে-ওপরে-নীচে যতো প্রাণী-অপ্রাণী আছে, প্রত্যেকের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। প্রাণের বিবর্তন হতে হতেই এমনটা হয়েছে, দানা বেঁধেছে পারস্পরিক-নির্ভরতা, তা থেকে রূপ নিয়েছে একটা নাজুক ভারসমতা। এর যদি সামান্যও হেরফের হয়, প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হয়, সব এলোমেলো হয়ে যায়, 'পরিবেশ-বিপর্যয়' ঘটে। এই পরিবেশকে মানুষ কিভাবে দূষিত করছে, তাতে আমাদের কী ক্ষতি হচ্ছে, ভবিষ্যৎ মানবজাতির ওপর তার প্রতিক্রিয়া কতোখানি হবে, এসব নিয়ে দেশবিদেশের বিজ্ঞানীরা গভীর অনুসন্ধান চালাচ্ছেন।

অদৃশ্য জুজু

প্রথম অধ্যায়ে আমরা বলেছি যে, বায়ু-দূষণ একদিন আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে সবচেয়ে বেশি ভয়ের কারণ হয়ে উঠবে। শুনে, হয়তো অবাক হতে পারো — মাথার ওপরে ওই যে 'অসীম' বায়ুমণ্ডল, হাজার-হাজার মিটার জায়গা নিয়ে ছড়িয়ে আছে মহাশূন্যে, কারখানার চিমনীর মিট্‌মিটে গ্যাস এবং হাওয়া গাড়ির পিটপিটে ধোঁয়া তাকে বিষাক্ত করে দিতে পারে! কিভাবে? নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্বের সেই নিয়মটা নিশ্চয় জানো, ওপরদিকে যতোই যাওয়া যায় ততোই কম হতে থাকে মাধ্যাকর্ষণের টান এবং বাতাসের ঘনত্ব। কেন জানো? বায়ুমণ্ডলের প্রথম সাড়ে-পাঁচ কিলোমিটার পর্যন্ত যতোটা ওজনের বাতাস আছে, ঠিক ততোটাই আছে তার ওপরকার বাকী অংশে। মনে করো — সাগরতল, ঘনত্ব যেখানে সবচেয়ে বেশি, সেখানে গোটা বায়ুমণ্ডলকে কোনরকমে টেনে নামিয়ে ঠেসেঠুসে একখানে জড়ো করা হল, তাহলে তারা কতোটা জায়গা জুড়বে বলতে পারো? — মাত্র ন'হাজার বর্গ মিটার! এবার বুঝতে পারছো, বায়ুমণ্ডল সত্যিই এতো 'অসীম' নয় যে দুনিয়ার যেখানে যতো চিমনী আর হাওয়াগাড়ি গ্যাস আর ধোঁয়া ছাড়ছে, সমস্তই সে শুষে নিতে থাকবে অনাদিকাল ধরে।

শিল্পোদ্যোগ যতো এগিয়ে চলেছে, দূষণের ভয়ও ততো বাড়ছে। জিজ্ঞেস করতে পারো, তাহলে কেন আমরা একটার পর একটা কল-কারখানা খুলছি, এতো লরী-বাস-মোটর তৈরি করছি? কম করলেই তো হয়! এককথায় জবাব দেওয়া মুস্কিল; কারণ শিল্পোদ্যোগের ফলে আমাদের লাভও যে অনেক হচ্ছে।

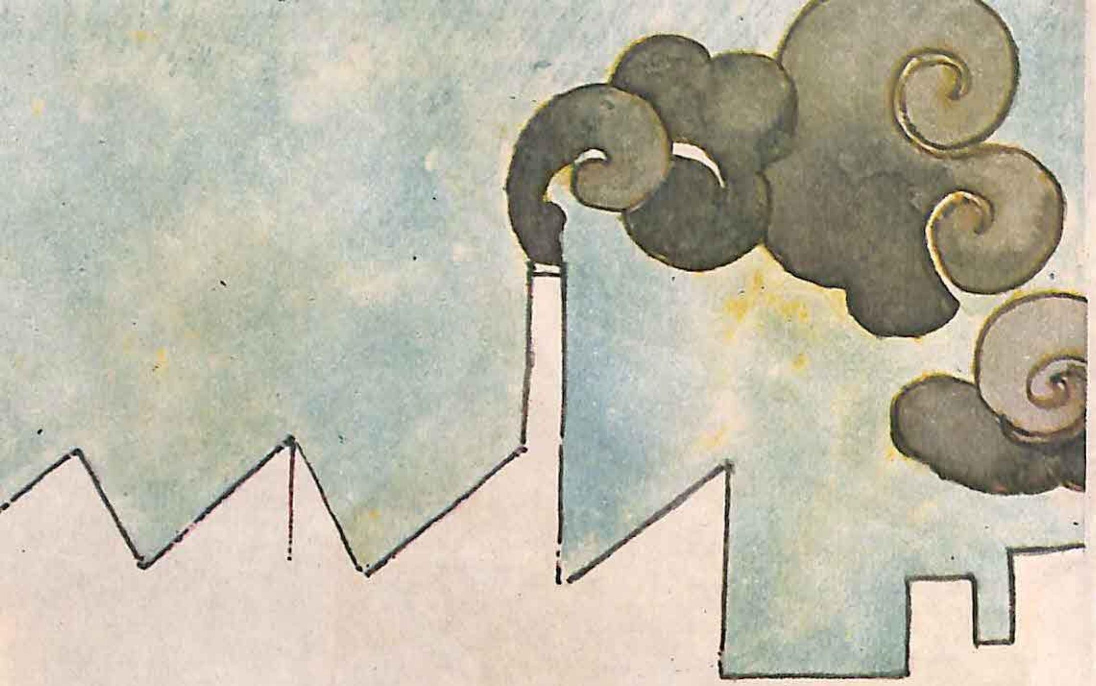
বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে আমাদের ডাক্তারি-বিদ্যার অনেক উন্নতি হয়েছে। যতো লোক জন্মাচ্ছে, মরছে তার চেয়ে অনেক কম; ফলে জনসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। আর লোক যতো বাড়ছে — খাদ্য, বস্ত্র, পানীয় — দৈনন্দিন প্রয়োজনের চাহিদাও বেড়ে যাচ্ছে। এই বাড়-বাড়ন্তর মাঝখানে সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকতে হলে শিল্পোদ্যোগ বাড়িয়ে যেতেই হবে।

পরিধেয় বস্ত্র উৎপাদনের জন্য আমাদের আরও কল-কারখানা বসাতে হবে। খাদ্য-উৎপাদন বাড়াবার জন্য আরও বেশি জমি চষতে হবে; তার জন্য চাই আরও বেশি ট্র্যাকটর এবং বেশি পরিমাণে কীটনাশক ওষুধ। এগুলো তৈরি করতে যতো বেশি কারখানা বসবে, তাদের চালু রাখার জন্য বিদ্যুৎশক্তির চাহিদাও বাড়তে থাকবে। এবং আরও বেশি বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করতে হলে আমাদের পোড়াতে হবে আরও বেশি তেল-কয়লা।

তোমরা হয়তো শুনে থাকবে, কয়লাকে বলা হয় 'কালো হীরা' এবং তেলকে 'তরল সোনা'। একেবারে ঠিক কথা। কারণ, কারখানা চালাবার জন্যে যে বিদ্যুৎশক্তি দরকার, তা একমাত্র এরাই উৎপন্ন করতে পারে। অথচ দুর্ভাগ্য দেখ, এহেন অতি-প্রয়োজনীয় জ্বালানী দুজনেই বায়ু-দূষণের কাজে পয়লা সারির আসামী। পৃথিবীর বুকে যতো কয়লা ও তেল আছে বলে আমরা জানি, তার প্রায় অর্ধেকটাই পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে গত পঞ্চাশ বছরে। আর, শিল্পায়নও এমন হু-হু করে বেড়ে যাচ্ছে, আগামী পঁচিশ বছরের মধ্যেই বাকি অর্ধেকও যদি শেষ হয়ে যায়, অবাক হবার কিছু নেই। দূষণ যে তখন কতো গুণ বেড়ে যাবে, সহজেই কল্পনা করতে পারো। এই অদৃশ্য জুজু বিপন্ন করবে আমাদের স্বাস্থ্যকে; শিল্পোদ্যোগের মূল লক্ষ্য — সুখী জীবন গড়ে তোলা — সমূলে ব্যর্থ হয়ে যাবে।

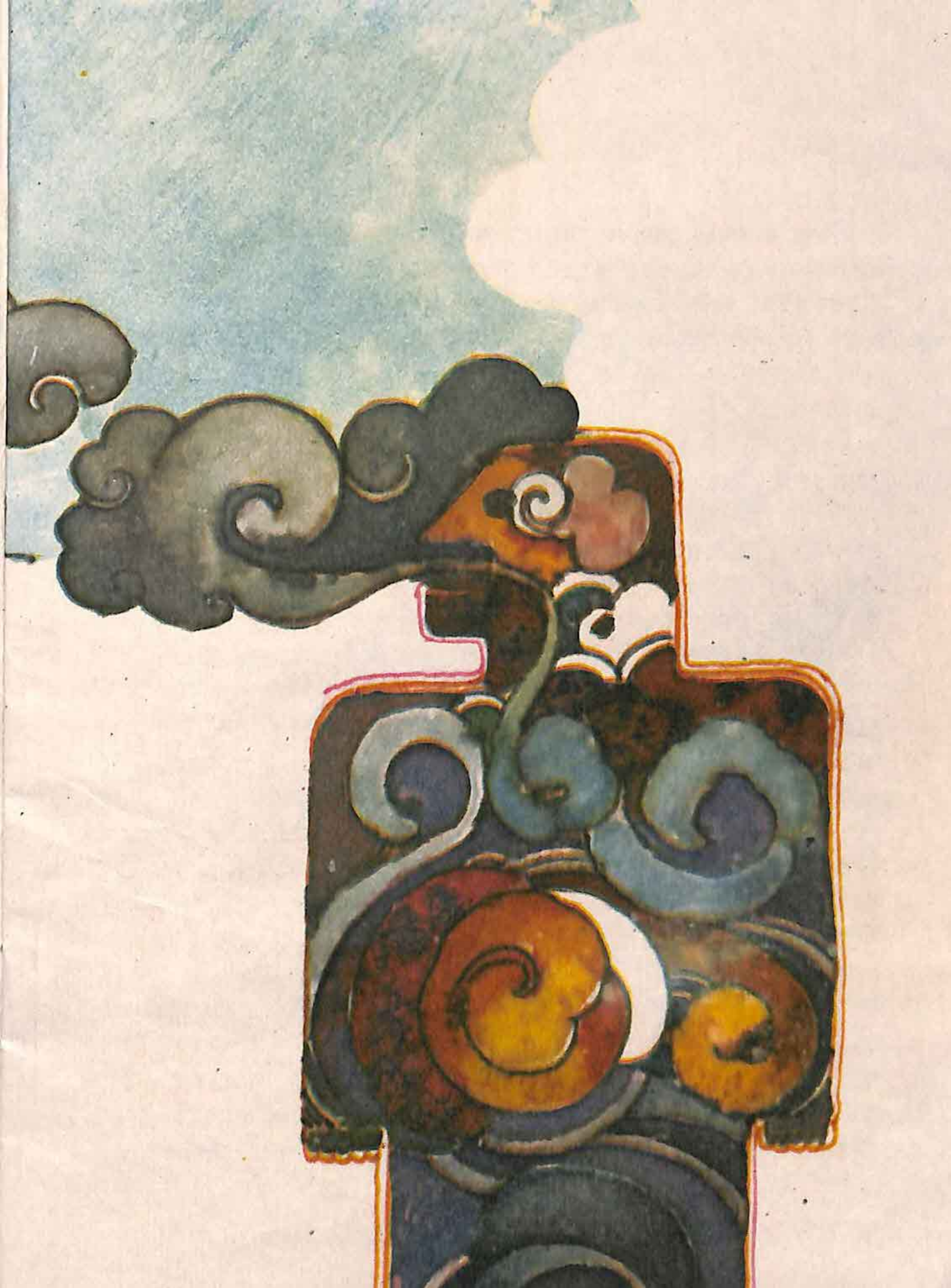
কয়লা বা তেল পোড়ায় এমন কোন শক্তি-উতপাদন কেন্দ্রে কখনও গেছো ? যদি না গিয়ে থাকো, একবার চেষ্টা কোর যেতে দিল্লীর ইন্দ্রপ্রস্থ এসটেট, বোম্বাইয়ের ট্রমবে বা আর কোথাও। দেখবে, চিমনীর মুখ দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। ইন্দ্রপ্রস্থ এসটেটের শক্তি-উৎপাদন কেন্দ্রটি চারপাশের প্রতি বর্গ কিলোমিটারে প্রায় তিরিশ টন করে দূষিত গ্যাস ছড়িয়ে দিচ্ছে, প্রতি মাসে। দীর্ঘদিন ধরে এই ধোঁয়া যদি তোমাদের গিলতে হয়, তার ফল কী হবে জানো ? মাথা ধরা, মাথা ঘোরা, চোখ-করকর, কান ঝাঁ-ঝাঁ





বমি, শ্বাসকষ্ট, এসব তো হবেই, অজ্ঞানও হয়ে যেতে পারো। তার কারণ, ওইযে ধোঁয়া, ও হচ্ছে বিপজ্জনক গ্যাস — 'কার্বন মনোকসাইড'।

কেন কার্বন মনোকসাইডে এইসব অসুখ হয়? আমাদের রক্তে 'হিমোগ্লোবিন' বলে একটি পদার্থ আছে যার কাজ অকসিজেনকে ধরে রাখা ও চালু রাখা। আমাদের কপাল এমনিই খারাপ, হিমোগ্লোবিন কার্বন মনোকসাইডকে নিয়েও একই কাজ করে এবং অকসিজেনের চেয়ে 200 গুণ তাড়াতাড়িই করে। সেটা আরও দুর্ভাগ্যের কথা! ধরা যাক — আমরা যে দূষিত বাতাস নিচ্ছি, তাতে রয়েছে 100 ভাগ অকসিজেন এবং একভাগ কার্বন মনোকসাইড। হলে হবে কি, রক্তে পৌঁছেই ওই একমাত্রার কার্বন মনোকসাইড হয়ে যাবে দুশো মাত্রার, অর্থাৎ অকসিজেনের দ্বিগুণ। রক্ত তখন আর আগের মতো অকসিজেন নিতে পারবে না, আর তখনই দেখা দেবে ওইসব লক্ষণ — মাথাধরা থেকে অজ্ঞান হওয়া পর্যন্ত। কোনটা হবে, সেটা নির্ভর করে রক্ত কতোটা অকসিজেন নিতে পারছে তার ওপর।



তেল বা কয়লা পোড়ালে কেন হয় কার্বন মনোকসাইড? যদি যথেষ্ট পরিমাণে অকসিজেন থাকে এবং কয়লা বা তেল অনেকক্ষণ ধরে পোড়ে, তাহলে উৎপন্ন হয় 'কার্বন ডাইঅকসাইড', খুবই নিরীহ গ্যাস। কিন্তু শক্তি-উৎপাদন কেন্দ্রে কয়লা বা গাড়ির ইঞ্জিনে পেট্রল পুরোপুরি কখনোই পোড়েনা — অকসিজেন থাকে কম, পোড়ার জন্য সময়ও বেশি পাওয়া যায় না। এই আধপোড়া তেল-কয়লা থেকেই সৃষ্টি হয় কার্বন মনোকসাইডের।

কার্বন মনোকসাইড একলাই যদি জুজুবুড়ো হত, তাহলে তাকে সামলানো এমন-কিছু কঠিন হত না। কিন্তু শক্তি-উৎপাদন কেন্দ্রগুলি যে আরও অনেকরকম রাসায়নিকের জন্ম দেয়। মোট 'সিলভার অকসাইড' ও 'নাইট্রোজেন অকসাইড'-এর অর্ধেক, এবং উড়ন্ত কালি-ঝুল-ভূষির এক-চতুর্থাংশেরও বেশিটাই আসে এখান থেকে। এ-অবস্থার সুরাহা যদি না করা হয়, আসছে পনেরো বছরের মধ্যেই বায়ুমণ্ডলে এইসব বিপজ্জনক রাসায়নিকের পরিমাণ দ্বিগুণ হয়ে যাবে।

ভারতের পূর্বাঞ্চলে মাটির তলায় প্রচুর কয়লা আছে, বিশেষত নীচু মানের কয়লা। স্বভাবতই, শক্তি উৎপাদন করতে মুখ্য জ্বালানী হিসেবে এর ব্যবহার চলতেই থাকবে; সে যতোই দূষণ ছড়াক না কেন। এবং যেহেতু যা সারানো যাবে না তাকে মেনে নিতেই হয়, চিমনী থেকে গ্যাস বেরিয়ে আসবেই। অতএব তাকে সাফ্‌সুরৎ করে বায়ুমণ্ডল-দূষণ কিভাবে কমানো যায়, তারই উপায় আমাদের বার করতে হবে।

একটা উপায় হচ্ছে, শক্তি-উৎপদান কেন্দ্রের আধপোড়া দাহ্য গ্যাসগুলোকে পরে সম্পূর্ণ পুড়িয়ে ফেলা। তাতে হবে কি, বিষাক্ত কার্বন মনোকসাইড পরিণত হবে নিরীহ কার্বন ডাইঅকসাইডে। 'ফ্লেয়ার' নামে সরঞ্জাম একাজ করতে পারে। দাম বেশি নয় বলে ভারতের মতো দেশের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী।

দূষণের সঙ্গে লড়াইয়ের সরঞ্জাম যখন রয়েছেই, তবে কেন প্রতিটি কারখানায় সেগুলো বসানো হচ্ছেনা? কারণ কী? কারণটা একটু জটিলই। একটা সত্যি ঘটনা শোনালেই বুঝতে পারবে। 1971 সালে, আমেরিকার টেক্সাস শহরে একটা নতুন ইস্পাত কারখানা বসানো হল। পাশেই ছিল একটা পশু-সংরক্ষণ কেন্দ্র। কারখানার কর্তৃপক্ষ তাঁদের দূষণ-নিয়ন্ত্রণ সরঞ্জামের জন্য বরাদ্দ মোট অর্থের শতকরা দশ ভাগই ব্যয় করলেন প্রতিবেশী পশু-সমাজের কল্যাণে। কারখানা দূষণমুক্ত রইল। সকলেই খুশি,







সংরক্ষণ-কেন্দ্রের পরিচালকরাও। বছর কয়েক বেশ গেল। তারপরেই ইস্পাত কারখানাটি পড়ল ফাঁপরে। দূষণ-মুক্ত কারখানা গড়তে গিয়ে বেশ-কিছু টাকা খরচ করতে হয়েছিল, তা মেটাতে গিয়ে উৎপন্ন ইস্পাতের দামও বাড়াতে হল। অন্যদিকে, প্রতিযোগী কারখানাগুলি যারা দূষণ-নিয়ন্ত্রণ সরঞ্জাম বাবদ এক পয়সাও খরচ করে নি, নিজেদের তৈরি ইস্পাত বেচতে লাগল অনেক সস্তায়।

এর একমাত্র জবাব : দূষণ নামক দুষমনের বিরুদ্ধে সবাই একজোট হয়ে লড়তে হবে, এবং কড়া আইন জারী করতে হবে যাতে প্রত্যেকটি কারখানা দূষণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হয়।

আর একটা উপায় হচ্ছে : কয়লা-তেলের ব্যবহার যতোদূর-সম্ভব কমিয়ে ফেলতে হবে এবং শক্তি-উৎপাদনের অন্যবিধ পদ্ধতি গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। আণবিক শক্তি কেন্দ্র একটি ভালো বিকল্প। এ সেই একই আণবিক শক্তি যা প্রযুক্ত হয় বিশ্ব-বিধ্বংসী আণবিক বোমায়। আসলে এর ব্যবহার হওয়া উচিত শক্তি-উৎপাদনে, বলা বাহুল্য, খুব সাবধানতার সঙ্গে। এথেকে যে 'রেডিও-অ্যাকটিভ' (তেজ-বিকীরণকারী) আবর্জনা বেরোবে, সেগুলো ফেলার নিরাপদ ব্যবস্থা করতে হবে। অরেকটা সুন্দর বিকল্প সূর্যালোক থেকে শক্তি-সংগ্রহ। এতে দূষণের কোন ভয় নেই। তবে সৌর শক্তি কেন্দ্র এখনও পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরে, এই পদ্ধতিতে ব্যাপকভাবে 'নির্দোষ' শক্তি-উৎপাদন করতে আমাদের আরও অনেক বছর লেগে যাবে। এছাড়া সমুদ্রের ঢেউ, জোয়ার-ভাঁটা, বাতাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক শক্তিকেও একাজে লাগানো যেতে পারে; কীভাবে, তা নিয়ে দুনিয়া জুড়ে গবেষণা করছেন বিজ্ঞানীরা।

ধোঁয়ার অন্তরালে

বায়ুমণ্ডল-দূষণের দ্বিতীয় বড় আসামী হাওয়াগাড়ি। কোন কোন শহরে এরা ধূমপানের চেয়েও আমাদের স্বাস্থ্যের বড় শত্রু। গোটা পৃথিবীতে প্রতি দশজনে একটা করে গাড়ি আছে। বিষাক্ত কার্বন মনোকসাইড ও নাইট্রোজেন অকসাইডের বেশির ভাগটাই এরা সরবরাহ করে। অথচ, মূল্যবান সম্পত্তি হিসেবে, জমি এবং বাড়ির পরেই, গাড়ির কদর। কাজেই, পরিবেশকে দূষিত করছে শুধু এই অপরাধেই মোটরগাড়ির উৎপাদন ও ব্যবহার, কোনটাই বন্ধ করা যাবে না। যা করতে পারি তা হল, দূষণ-নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র লাগিয়ে ওদের যতোটা পারা যায় কাবুতে নিয়ে আসা।

গাড়ির মালিক যদি একটা 'রিসাইক্লার'-এর জন্যে 2000 টাকা মতো খরচ করেন, দূষণের মাত্রা অনেক কমে যাবে। যন্ত্রটি ইঞ্জিনে আ-পোড়া বিষাক্ত হাইড্রো-কার্বন মিশ্রকে জমতে দেয় না। দূষণকে একেবারে খতম করতে পারে না বটে, তবে সস্তা। মালিক যদি আরও বেশি খরচ করতে রাজি থাকেন, দূষণ-নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র আরও ভালো কাজ দিতে পারে। কিছুদিন আগেই একটা যন্ত্র বেরিয়েছে যাতে 'ব্লো-টর্চ'-এর সাহায্যে অতি উচ্চ তাপে হাইড্রোজেন ও কার্বন মিশ্রকে পুড়িয়ে ফেলা যায়। আরেকটা কাজের যন্ত্র 'মাফলার', গাড়ি থেকে দূষণের নব্বুই ভাগই গায়েব করে দিতে পারে; তবে দামও তেমনি।

হাওয়াগাড়ি থেকে আর যেসব পাদার্থ বেরিয়ে আসে, তারা যেমন মারাত্মক রকম বিষাক্ত তেমনি নাছোড়বান্দা — কিছুতেই খতম হতে চায় না। সবচেয়ে পাজী হচ্ছে —

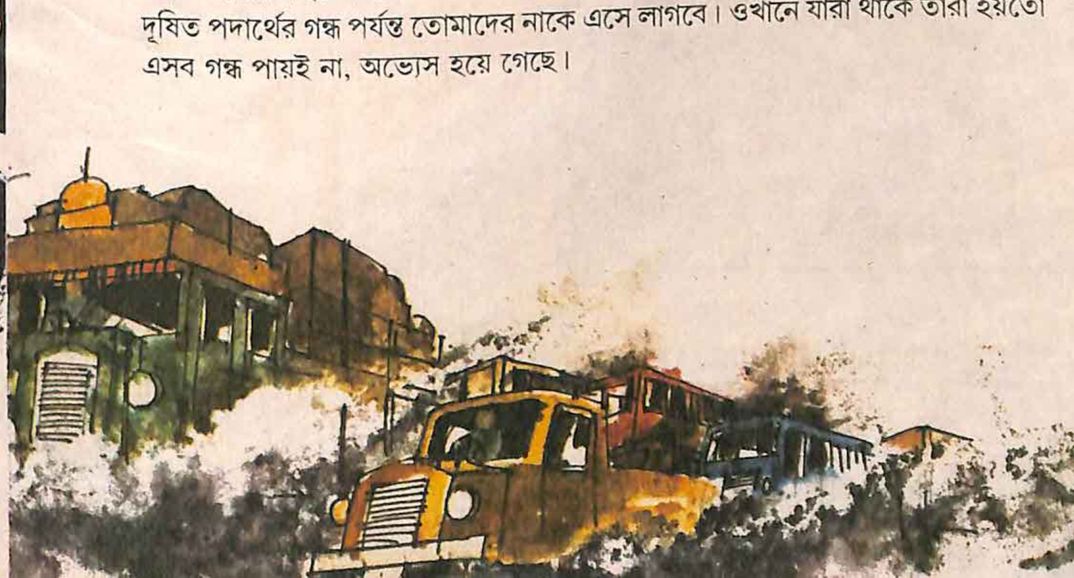


সীসা : মানুষ ও পশু দুইয়ের পক্ষেই বিপজ্জনক। তা সত্ত্বেও, কয়েক ধরনের উচ্চশক্তি-সম্পন্ন পেট্রলে সীসা মাখানো রাসায়নিক মেশানো হয়। একা আমেরিকাতেই, 'দূষণের গুরু' এই সীসার ওজন হবে ভারত ও চীনের মিলিত জনসংখ্যার ওজনের চেয়েও বেশি।

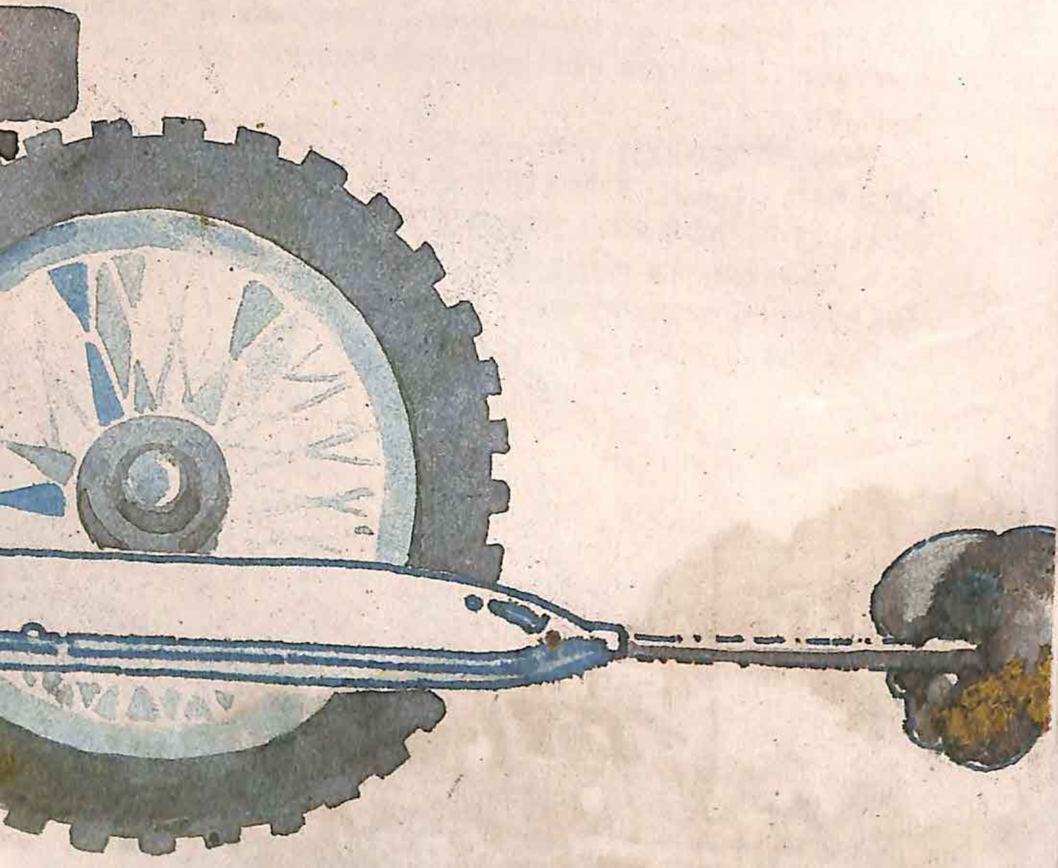
দূষণ-নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের দাম বেশি বলে অনেক গাড়ির মালিক কিনতে চান না। এর প্রতিকার সরকারই করতে পারেন, কারখানাগুলিকে নির্দেশ দিতে পারেন — তৈরির সময়েই যন্ত্রটি যাতে গাড়িতে লাগিয়ে দেওয়া হয়। পুরনো গাড়ির মালিকদেরও এব্যাপারে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বাধ্য করতে হবে। সেইসঙ্গে জোর দিতে হবে বিকল্প পরিবহন ব্যবস্থার ওপর, বৈদ্যুতিক রেল যার মধ্যে একটি।

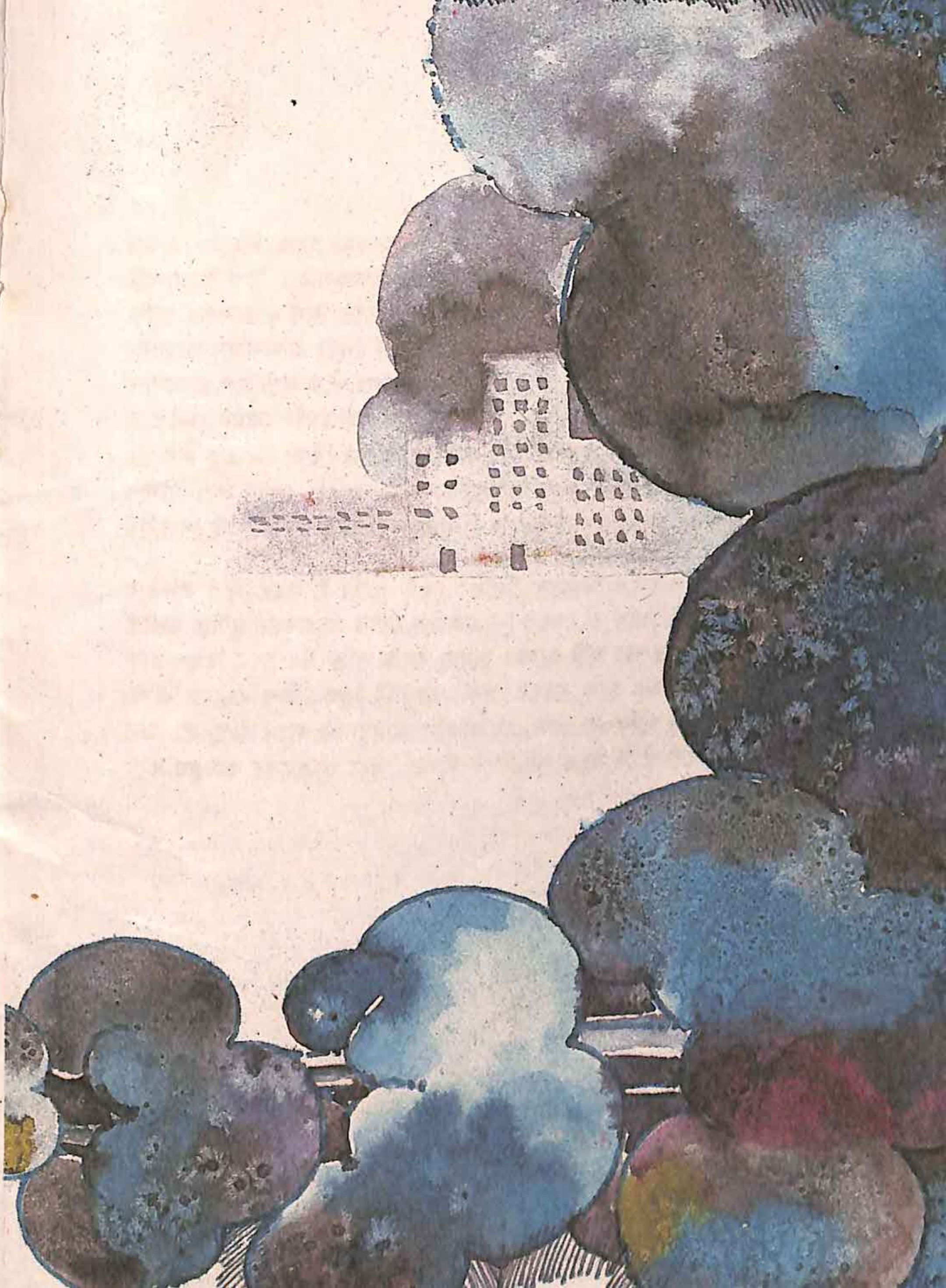
শক্তি-উৎপাদন কেন্দ্র, হাওয়াগাড়ি, তারপর তৃতীয় বড় আসামী কল-কারখানার ওই চিমনীগুলো, বায়ু-দূষণে এদের দায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ। প্রথম দুই আসামীর সঙ্গে এদের তফাৎ — শিল্প হরেক রকম জিনিস তৈরি করে, ফলে হরেক রকম দূষিত রাসায়নিকও।

শিল্পোদ্যোগ যতো বেড়ে যাচ্ছে, নতুন নতুন জাতের বিষাক্ত রাসায়নিকও ততো ছড়িয়ে পড়ছে বায়ুমণ্ডলে। তাদের মধ্যে কে-যে কখন কী-ধরণের অসুখ বাধাবে, কেউ বলতে পারে না। দরজা-জানলা-দেয়াল ক্ষয়ে-ক্ষয়ে যাচ্ছে, এ-ধরণের রোগের সঙ্গে অনেক শিল্প-শহরের লোক পরিচিত। এরকম কোন শহরে যদি কখনও যাও, বাতাসে দূষিত পদার্থের গন্ধ পর্যন্ত তোমাদের নাকে এসে লাগবে। ওখানে যারা থাকে তারা হয়তো এসব গন্ধ পায়ই না, অভ্যেস হয়ে গেছে।



ভারত, তাইল্যাণ্ড, ফিলিপিন ইত্যাদি উন্নয়নশীল দেশে এখন শিল্প-উদ্যোগের হিড়িক পড়ে গেছে অথচ দূষণের ভয়ংকর পরিণাম সম্পর্কে কেউই তেমন সচেতন নয়। এইসব দেশের বড় বড় শহরে দূষণের ভয়াবহ রূপ ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে — ঠিক যেরকমটি হয়েছিল, এই শতকের গোড়ার দিকে, য়ুরোপের শহরগুলিতে। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইংলণ্ডের 'কার্পাস-শহর' ম্যানচেসটারে যে পরিমাণ দূষণ বিরাজ করত, তার চেয়ে ছ'গুণ বেশি এখনই করে উত্তর প্রদেশের 'বস্ত্র-শহর' কানপুরে। শহরে শুধু কারখানাগুলোই যতো বিষ ছড়ায় তার পরিমাণ হবে গোটা কানপুরবাসীদের ছড়ানো দূষণের সমান। আর একটা শহর : বোম্বাই। আর কুড়ি বছরের মধ্যে বোম্বাই ও তার আশেপাশে কারখানার সংখ্যা বেড়ে যাবে তিনগুণ। কিন্তু এখনই 1000 টনেরও বেশি





বিষাক্ত রাসায়নিক উপাদান, ধুলো-কালি-ভূষো ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে শহরের মাথার ওপর। জাতিসংঘের হিসেব অনুযায়ী বায়ুমণ্ডলে সালফার-অকসাইড মিশ্র যতোখানি থাকলে ভয়ের কিছু নেই, বোম্বাইয়ের আকাশে-বাতাসে রয়েছে তার দু'গুণেরও বেশি, এবং কোন-কোন এলাকায় এর পরিমাণ বিপদ-সীমা ছাড়িয়ে গেছে অনেকদিন আগেই। আমরা শুধু আশা করতে পারি যে 1952 সালের ডিসেম্বরে লন্ডনে যা ঘটেছিল, আমাদের কোন শহরে যেন তা কোনদিনই দেখা না দেয়। সে বছর, আবহাওয়াটা কেমন যেন হয়ে গেল, শহর জুড়ে জমাট-কুয়াশা, তাকে জড়িয়ে ধরল তালতাল ধোঁয়া — এক নাগাড়ে পাঁচ দিন। সেই অদ্ভুত 'ধোঁয়াশা'-য় প্রাণ হারিয়েছিল কম করেও 4000 লন্ডনবাসী। যেভাবে দূষণ বেড়ে চলেছে তাকে তখনই রুখতে না পারলে বোম্বাইয়েরও একই শোচনীয় হাল হতে পারে।

আমরা চাই নির্মল বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে। সেই আমরাই বছর-বছর এনতার কয়লা-তেল পুড়িয়ে চলেছি, আর তা থেকে — একজন লোক যতোখানি দূষিত করতে পারে তার চারগুণ সমান দূষণের সৃষ্টি হচ্ছে। 2000 অব্দে শক্তি-উৎপাদন দ্বিগুণ হয়ে গেলে দূষণের চেহারাটা কেমন হবে, ভেবে দেখ। আগামী ত্রিশ-চল্লিশ বছরের মধ্যে, পৃথিবীর যে-প্রান্তেই আমরা থাকি না কেন, যে বাতাস আমরা নিঃশ্বাসে নেব, তা আর নিরাপদ থাকবে না। আমরা ধীরে ধীরে পৃথিবীকে বিপন্ন, বেঁচে থাকাকেই অসম্ভব করে তুলছি।

ধূসর ভবিষ্যৎ

মহাকাশচারীদের রিপোর্টে প্রকাশ : ভূ-প্রদক্ষিণরত মহাকাশযান থেকে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে তাঁরা দেখতে পেয়েছেন — মধ্য-আফ্রিকা, ব্রেজিল ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ওপরে একটানা নীল-নীল, এবং চীন, ভারত-উপমহাদেশ, পশ্চিম এশিয়া ও আফ্রিকার কিছু অঞ্চলের ওপরে ঝাপ্সা-বাদামী ধুলো জমাট বেঁধে রয়েছে। বেপরোয়া কৃষি-আবর্জনা পুড়িয়ে-পুড়িয়ে এবং বন-কে-বন উজাড় করে দিয়ে মানুষই এই অবস্থার সৃষ্টি করেছে। এতে প্রমাণিত হয় : শিল্পোন্নত দেশগুলিই একমাত্র অপরাধী নয়। হালফিল গবেষণায় দেখা গেছে, দুনিয়ার তাবৎ কারখানা একজোট হয়ে যতো দূষণ ছড়ায়, প্রায় ততোখানিই ছড়ায় উষ্ণ-অঞ্চলের তৃণভূমির আগুন এবং কৃষি-আবর্জনা দাহ। চাষের জমি, পশুচারণভূমি, মাঠ-ময়দান মিলিয়ে পৃথিবীতে 2,000,000,000 হেক্টর মতো দাহ্য ভূমি আছে। এর কোন-না-কোন অংশ ঋতুতে-ঋতুতে আগুনে পুড়ছেই। হিসেব যা পাওয়া গেছে, প্রত্যেক বছর 6,000,000,000 টনেরও বেশি কৃষি-আবর্জনা খড়কুটো গাছগাছড়া পোড়ানো হয়ে থাকে, এবং তাবৎ ছাইভস্ম-ধুলো-ময়লা গিয়ে জমা হতে থাকে বায়ুমণ্ডলে।

শুধু গ্রীষ্মমণ্ডলীয় তৃণাঞ্চলেই প্রতি হেক্টর চাষের মাঠে পাঁচ টন মতো কৃষি-আবর্জনা জড়ো হয় যা আগুনের খাদ্য। অনেক দেশে, ভারতের অনেক অঞ্চলেও, ধান-চাষের পরেই মাঠের আবর্জনা কেটে পুড়িয়ে ফেলা হয়। গাছগাছড়া শুধু নয়, এইসব আগাছা-খড়কুটোতেও প্রচুর পরিমাণে কার্বন থাকে। আগুন লাগলে ক্ষুদে-ক্ষুদে





কার্বন-কণা, ভূষো-কালি ওপরে উঠে যায় এবং বায়ুমণ্ডলে ভেসে বেড়াতে থাকে অনেকদিন ধরে।

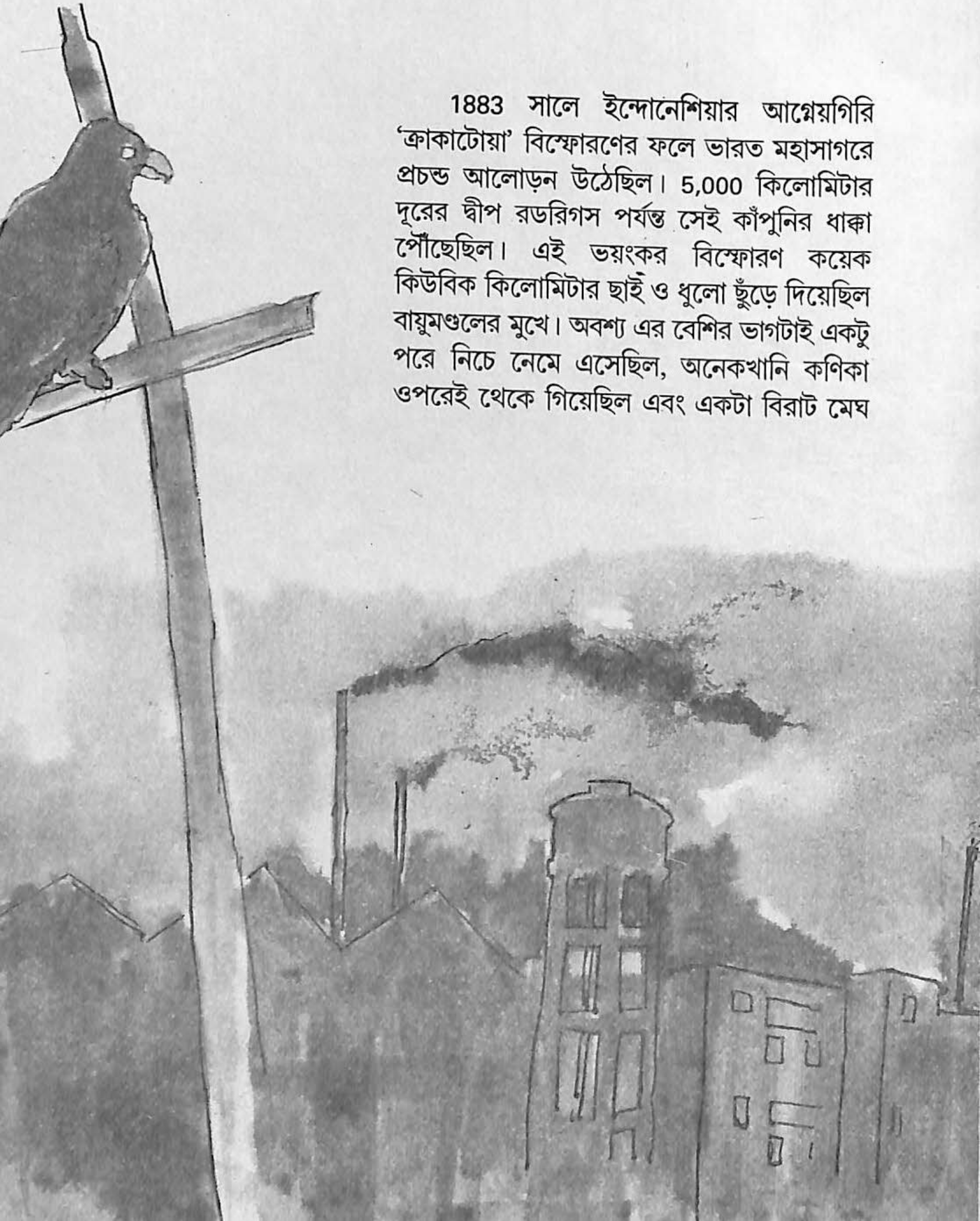
দূষণের আর-এক উৎস ডি ডি টি-র মতো রাসায়নিক পদার্থ। ডি ডি টি-র ব্যবহার তো কয়েক দশক ধরেই চলে আসছে। এই কীটনাশক ওষুধগুলো এক-একটা বিষ এবং খাদ্যশস্যকে দূষিত করে।

বাতাসে ভাসমান ধুলো-ঝুল-ভূষো-কালির গুঁড়োদের ডাকনাম 'কণিকা'। এই ক্ষুদে শয়তানদের জন্ম দেয় মানুষ, চাষের মাঠে আগুন জ্বালিয়ে ও শিল্পোদ্যোগ বাড়িয়ে; আবার প্রকৃতিও — অগ্ন্যুৎপাত মারফৎ। বিজ্ঞানী ও আবহাওয়াবিদরা মনে করেন, দলে ভারী হলে কণিকারা যে কোন দেশের জলবায়ুও বদলে দিতে পারে।

মানুষের তৈরি দূষণ জলবায়ুকে কিভাবে বদলে দিতে পারে তা বুঝতে হলে প্রথমে জানা দরকার, অতীতে বড়-বড় অগ্ন্যুৎপাতের ফলে কিভাবে জলবায়ুর হেরফের হয়েছিল।

ফেলে-আসা ইতিহাসের দিকে একটু পিছিয়ে যাওয়া যাক।

1883 সালে ইন্দোনেশিয়ার আগ্নেয়গিরি 'ক্রাকাটোয়া' বিস্ফোরণের ফলে ভারত মহাসাগরে প্রচন্ড আলোড়ন উঠেছিল। 5,000 কিলোমিটার দূরের দ্বীপ রডরিগস পর্যন্ত সেই কাঁপুনির ধাক্কা পৌঁছেছিল। এই ভয়ংকর বিস্ফোরণ কয়েক কিউবিক কিলোমিটার ছাই ও ধুলো ছুঁড়ে দিয়েছিল বায়ুমণ্ডলের মুখে। অবশ্য এর বেশির ভাগটাই একটু পরে নিচে নেমে এসেছিল, অনেকখানি কণিকা ওপরেই থেকে গিয়েছিল এবং একটা বিরাট মেঘ



হয়ে উড়ে গিয়েছিল পশ্চিমদিকে। এটা ঘটেছিল 1883 সালের 26 আগস্ট; 10 সেপ্টেম্বরের মধ্যে ধুলো-মেঘটা পৃথিবীর চারদিকে একটা পাক মেরে এল, তারপরেও সমানে চক্কর লাগাতে লাগল। এই ঘুরপাক-চলার পথে পথে মেঘটা ছড়িয়ে পড়তে লাগল, ধুলো ছিটোতে লাগল, ঢেকে ফেলল প্রায় গোটা ভূমণ্ডলটাই। বায়ুমণ্ডল ঝাপসা হয়ে গেল, তাকে ভেদ করে আসতে গিয়ে রোদের তেজ গেল কমে। যেহেতু সূর্যের আলোই জলবায়ুকে রূপ দেয়, পৃথিবীর অনেক জায়গায় আবহাওয়ার বেশ অদলবদল ঘটল। এখন, এইধরনের ধুলোর কণিকারা যদি অনেকখানি জায়গা জুড়ে, অনেকদিন ধরে, বায়ুমণ্ডলে ভেসে বেড়াতে থাকে, তাহলে সূর্যের আলোও তাতে প্রতিহত হয়ে ফিরে যেতে থাকে মহাশূন্যে; খুব অল্পই এসে পৌঁছতে পারে পৃথিবীর বুকে। অথচ এই আলোই হচ্ছে সূর্যের তেজ, শক্তি, এনার্জী। মাটির বুকে এসে পৌঁছয় রোদ হয়ে, ফিরে যায় তাপ ইত্যাদি নানান রূপে-বিরূপে। ওদিকে যখন বায়ুমণ্ডলে ভাসমান ধুলোর পাঁচিল পেরিয়ে কম সূর্যালোকই নিচে আসতে পারে, এদিকে তখন মাটি থেকে তাপের ভাগ, যে করেই



হোক, মহাশূন্যে পৌঁছে যায়, এবং প্রচুর পরিমাণেই। অর্থাৎ যতোটা এনার্জী নেমে আসে মাটিতে, তার চেয়ে বেশি এনার্জী এখান থেকে বেরিয়ে যায়, তারই জোরে বাতাস খেলা করে, সমুদ্রে জোয়ার-ভাটা, মেঘ জমে, বৃষ্টি হয়, ঝড়ও। কাজেই এই এনার্জী যতো কম হবে, আবহাওয়ারও ততোই ইতরবিশেষ ঘটবে। এবং এরকম ব্যাপার যদি কয়েক বছর ধরে চলতে থাকে, বদলে যেতে থাকবে জলবায়ুও (দীর্ঘস্থায়ী আবহাওয়ারই অপর নাম-রূপ)। বিজ্ঞানীরা যদিও নিশ্চিত যে বায়ুমণ্ডলে যতোবেশি ধুলো জমে, ততোই তারা প্রভাবিত করে আবহাওয়া ও জলবায়ুকে, তবে কতোখানি করে এখনও তারা বলতে পারেন না।

আর একটা অপ্রত্যাশিত উৎস থেকে ধুলি-দূষণের জন্ম হয়। হালফিল, মানুষ বেশি করে নাক গলাচ্ছে প্রকৃতির অন্দরমহলে। ফলে ধুলোর পরিমাণ যাচ্ছে বেড়ে, বাতাস তাদের পৌঁছে দিচ্ছে বায়ুমণ্ডলে। উত্তর আমেরিকার সীমাহীন সমতলভূমিতে কৃষিকাজ বড়-বড় আঁধির জন্যে দায়ী। ভারতে এই আঁধির সঙ্গে আমরা পরিচিত — থর মরুভূমি থেকে উঠে ধুলোকে উড়িয়ে নিয়ে যায় দিল্লীর মতো দূর অঞ্চলেও। তৃণভূমিতে আতিরিক্ত পশুচারণের ফলেই মাটির স্বভাবচরিত্র এভাবে বদলে যায় বলে মনে করা হয়, এবং সেটা করে মানুষই।

বায়ুমণ্ডলে এই ধুলোর সাথে যোগ দেয় কারখানার চিমনী থেকে অনবরত বেরিয়ে-আসা 'সালফার-ডাইঅকসাইড', 'হাইড্রোজেন-সালফাইড'-এর মতো সব বিযাক্ত গ্যাস। পচনকরা গাছপালা ও প্রাণীদেহ থেকেও এদের জন্ম হয়। যদিও ঘন্টা-কয়েকের মধ্যেই এইসব গ্যাস ছিড়িয়ে-ছটিয়ে পড়ে, সেইটুকু সময়ের মধ্যেই, অ্যামোনিয়ামের সঙ্গে মিলে, সালফার-ডাইঅকসাইড তৈরি করে ফেলে গুঁড়ি-গুঁড়ি 'অ্যামোনিয়াম-সালফাইড'। এরা বায়ুমণ্ডলে ভেসে বেড়ায় দীর্ঘদিন। অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি, ধূলি-ধূসরিত ভবিষ্যৎ-রচনায় মানুষ ছাড়িয়ে যাচ্ছে প্রকৃতিকেও।

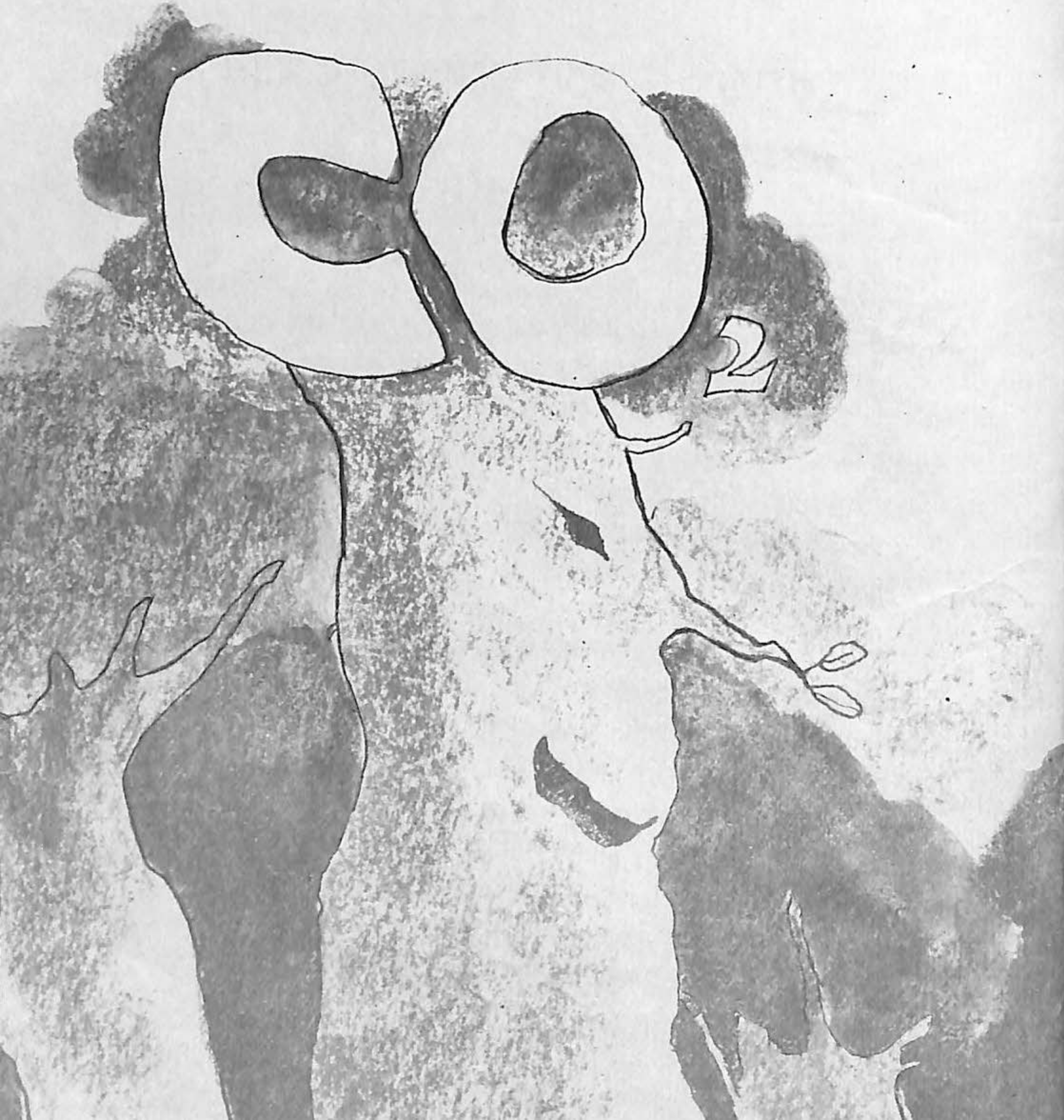
কতোখানি হলে তবে অনেকখানি ?

আমরা অকসিজেন নিই, ছাড়ি কার্বন-ডাইঅকসাইড। বেশির ভাগ পশু, পাখি, সরীসৃপ, মাছ, পোকামাকড়রাও তাই করে। অন্যদিকে, প্রায় সবরকম উদ্ভিদই নেয় কার্বন-ডাইঅকসাইড, ছাড়ে অকসিজেন। বাতাসে উভয়ের অনুপাত যদি দীর্ঘদিন ধরে সমান-সমান থাকে, তাহলে বুঝতে হবে — উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের পরস্পর জীবনধারায় চমৎকার একটা ভারসাম্য বজায় আছে। কিন্তু কার্বন-ডাইঅকসাইডের মাত্রা যদি বাড়িয়ে দেওয়া হয় বায়ুমণ্ডলে, তাহলে কী হবে ? লক্ষ লক্ষ বছর ধরে প্রকৃতি যে-ভারসমতার সৃষ্টি করেছে, তার কি কোন হেরফের হবে ?

মানুষ বা প্রকৃতির কোন্ কোন্ কাজের ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাইঅকসাইডের মাত্রা বেড়ে যেতে পারে ?

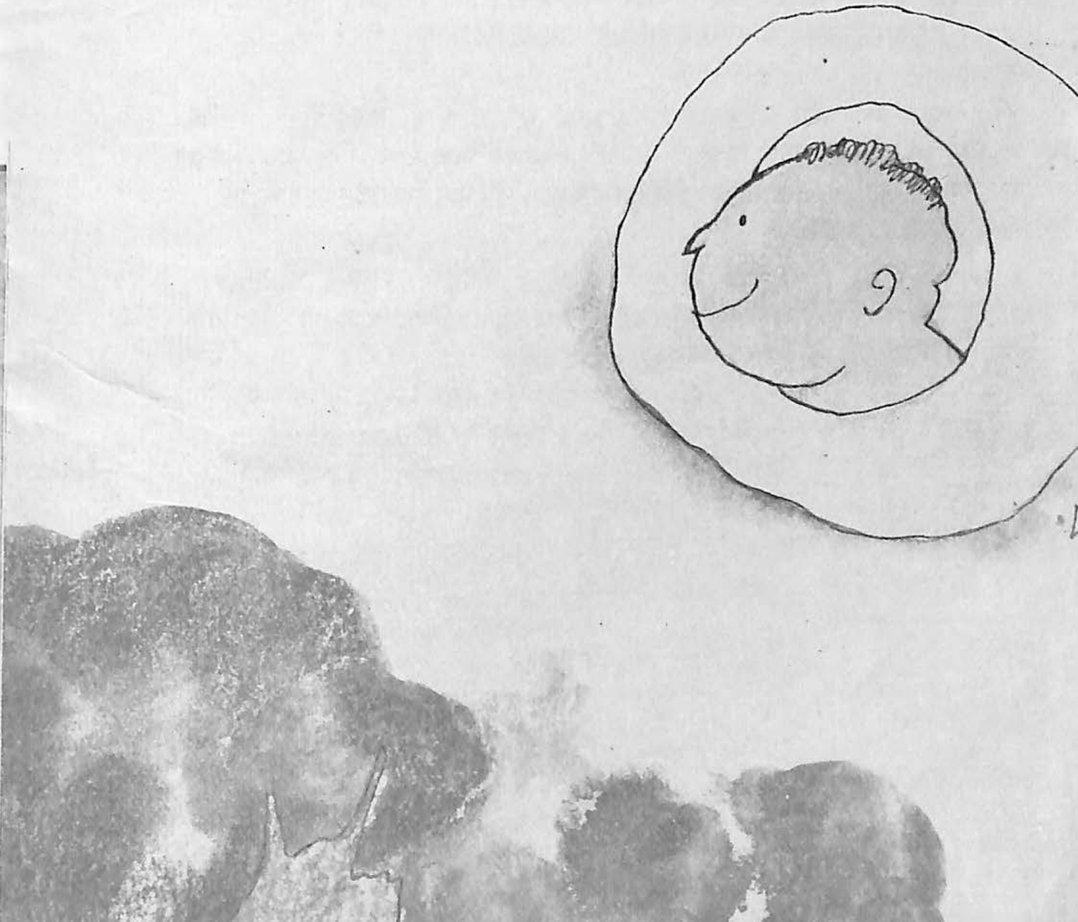
কার্বন-ডাইঅকসাইডের মূল আদান-প্রদান হয় বায়ুমণ্ডল এবং উদ্ভিদের মধ্যে। বায়ুমণ্ডল থেকে যায় উদ্ভিদদেহে; গাছপালার ক্ষয় ধরলে কার্বন-ডাইঅকসাইড ফিরে যায় নিজের জায়গায়। উদ্ভিদ কার্বন-ডাইঅকসাইড গ্রহণ করে বসন্তে ও গ্রীষ্মে, এবং ত্যাগ করে শীতকালে, যখন মরতে থাকে। এই কারণে বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাইঅকসাইডের পরিমাণ ঋতুতে-ঋতুতে কমবেশি হতে থাকে।

এ ব্যাপারে সমুদ্রের ভূমিকাও কম নয়। কারণ বায়ুমণ্ডল থেকে সেও কার্বন-ডাইঅকসাইড নেয়, যার বেশিটাই জমা হয় গিয়ে গভীর তলদেশে, ওপরের দিকে কম। সমুদ্র যেমন কার্বন-ডাইঅকসাইড নেয়, তেমনি দেয়ও। বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাইঅকসাইড যদি কমে যায়, আমরা আশা করতে পারি, সামুদ্রিক কার্বন-ডাইঅকসাইড তা পূরণ করে



দেবে। কিন্তু কমার বদলে বেড়ে যায় যদি, তাহলে কী হবে? সেই অতিরিক্ত কার্বন-ডাইঅকসাইড কি সমুদ্র শুষে নেবে?

এ নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে, ঠিক জবাবটা আজও মেলে নি। কয়েকজন বিজ্ঞানী মনে করেন : সমুদ্র যদিও বা অতিরিক্ত কার্বন-ডাইঅকসাইডের কিছুটা হালকা করে দিতে পারে, বেশিদিন ধরে রাখতে পারবে না, একটা সময়ে ফিরিয়ে দেবেই দেবে বায়ুমণ্ডলকে। অন্য একদলের ধারণা : অতিরিক্ত বোঝাটা সমুদ্র ও উদ্ভিদেই গিয়ে জমা হবে, তবে একটু সময় নেবে। প্রথম অভিমতটা যদি সত্যি হয়, তবে তো কার্বন-ডাইঅকসাইডও হয়ে



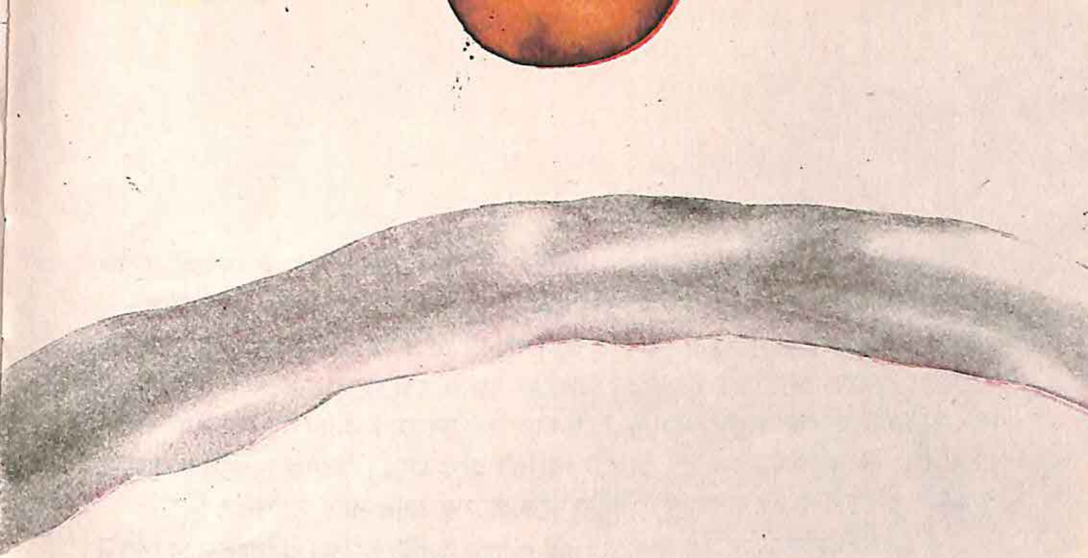
উঠবে আরেক দূষক, যাকে নিয়ে আমাদের সাবধান হওয়া দরকার।

জীবাশ্ম থেকে কয়লা-তেল ইত্যাদি জ্বালানী তৈরির জন্য মাটিও বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন-ডাইঅকসাইড নিয়ে থাকে — তবে সে খুবই কম, প্রতি 10,000 টনে এক ভাগ মাত্র। কিন্তু এই জ্বালানীই যখন পোড়ানো হয়, তখন ওই এক ভাগ কার্বন-ডাইঅকসাইডই বেরোতে থাকে 1,000 গুণেরও বেশি হয়ে।

কতো লক্ষ লক্ষ বছর ধরে, কঠোর পরিশ্রমে, প্রকৃতি তৈরি করেছে এইসব জীবাশ্ম-জ্বালানী, আর শিল্পায়নের মাত্র একশো বছরের মধ্যেই সেসব জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে শেষ করে দেওয়া হচ্ছে। এই গতিতে চলতে থাকলে, আগামী পঁচিশ বছরের মধ্যে, বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাইঅকসাইডের পরিমাণ ভয়াবহরকম বেড়ে যাবে। তারফলে প্রকৃতির ভারসাম্য বিপর্যস্ত হয়ে যেতে পারে।

বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাইঅকসাইডের মাত্রা খুব বেশি না, শতকরা 0.03 মাত্র। তবু জলবায়ুর ওপর এর প্রভাব অবশ্যই পড়ে বলে অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন। এ ধারণা যদি আংশিকও সত্য হয়, এবং কার্বন-ডাইঅকসাইডের পরিমাণ বেড়েই যেতে থাকে, দুর্বিপাক কেউ ঠেকাতে পারবে না।

এমনও মনে করা হচ্ছে যে এভাবে চলতে থাকলে, 'বরফ-যুগে' বায়ুমণ্ডলে যে পরিমাণ কার্বন-ডাইঅকসাইড ছিল, সেই অবস্থাই আবার ফিরে আসবে। পৃথিবীর জলবায়ু নিয়ে আমরা বোধহয় বিপজ্জনক খেলায় মেতেছি।



ওযোন স্তর

মাটির ওপর বিশ থেকে ত্রিশ কিলোমিটারের মধ্যে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল এক জাতীয় বর্ণহীন বাষ্পীয় পদার্থ দিয়ে ঢাকা, যাকে বলা হয় 'ওযোন স্তর'। কয়েক কিলোমিটার পুরু এই স্তরটি গোটা ভূ-মণ্ডলের ওপর ছাতার মতো ছড়িয়ে আছে এবং নিচেকার তাবৎ প্রাণীকে রক্ষা করছে সূর্যের (সাতরঙা আলোর বেগুনী রেখারও বাইরের) আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মির শতকরা নিরানব্বুই অংশ থেকে। এই স্তরের আড়াল না থাকলে আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মির গোটা ঝাপটাটাই এসে পড়ত পৃথিবীর বুকে; এবং বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, এই রশ্মির ছোঁয়া বেশি লাগলে পশু ও মানুষের চামড়ায় নানান উপসর্গ দেখা দিতে পারে এমনকি চর্ম-ক্যানসারও হতে পারে।



বিজ্ঞানীরা এমনও মনে করেন যে পৃথিবীর যে জলবায়ু আজ আমরা দেখছি, তারও মূলে রয়েছে ওযোন স্তর। এটা যদি নষ্ট হয়, পৃথিবী হয়ে উঠবে একটা বিরাট 'গ্রীনহাউস' — দুর্বল লতাপাতাদের রক্ষার জন্য তৈরি ছিদ্রহীন কাঁচঘরের মতো। গ্রীনহাউসের ছাদ সূর্যের আলোকে ঢুকতে দেয় কিন্তু ভেতরের তাপকে সহজে বেরোতে দেয় না। পৃথিবী যদি সত্যিসত্যিই এইরকম 'সবুজ কাঁচঘর' হয়ে যায়, তাহলে মেরু-অঞ্চলের সব বরফ গলে যাবে এবং সব জায়গায় জলবায়ু ওলোট-পালোট হয়ে যাবে। অনেক বিজ্ঞানীর বিশ্বাস, ওযোন স্তর তৈরি না হওয়া পর্যন্ত পৃথিবীর বুকে প্রাণের আবির্ভাবই সম্ভব হয় নি।

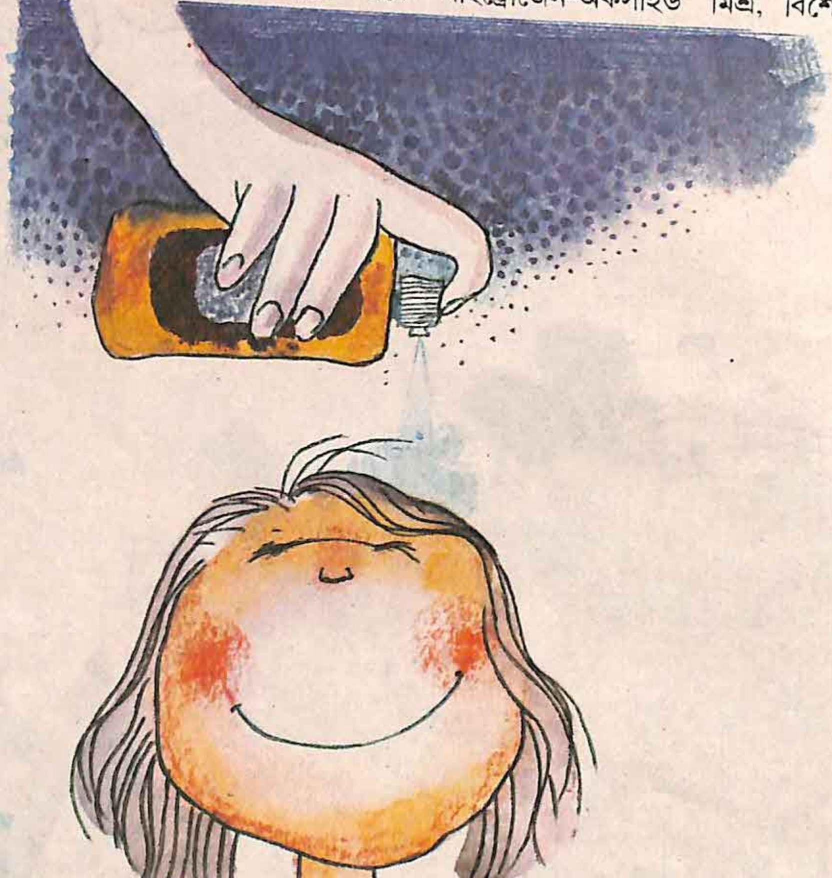
অতএব, ফিনফিনে নাজুক-স্বভাবের এই ওযোন স্তরটিকে রক্ষা করতেই হবে। কিন্তু





তিনটে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ইতিমধ্যেই বায়ুমণ্ডলে এমন কতকগুলো বিষাক্ত রাসায়নিক পাঠাতে শুরু করেছে যারা ওযোন স্তরের নিচের অংশকে খেয়ে-খেয়ে ফেলছে।

ব্যবসাবাণিজ্যের সূত্রে বা ট্যুরিস্ট হিসেবে লোকেদের যাতায়াত আজকাল খুব বেড়ে গেছে। গন্তব্যস্থলে তাড়াতাড়ি পৌঁছতে হবে, চাই দ্রুত থেকে দ্রুততর যান। এই চাহিদা মেটাবার জন্যে আবির্ভূত হয়েছে 'সুপারসোনিক' বা শব্দেরও আগে ছুটন্ত পরিবহনের যুগ। এই শ্রেণীর উড়োজাহাজ তৈরির পেছনে ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা এবং রাশিয়া কোটি-কোটি ডলার ব্যয় করে চলেছে। দুর্ভাগ্যের কথা, ওপরের বায়ুমণ্ডলকে দূষিত করার আরেক ওস্তাদ এই সুপারসোনিক পরিবহন। এই উড়োজাহাজের জেট থেকে যে আবর্জনা সবেগে বেরোয়, তাতে থাকে 'নাইট্রোজেন-অকসাইড' মিশ্র, বিশেষত



'নাইট্রিক-অকসাইড' যা ওযোন স্তরের পরম শত্রু। ইদানীং অনেক দেশ তাদের আকাশে সুপারসোনিক প্লেনের চলাচল বন্ধ করে দেবার কথা ভাবছে; সবাই কিন্তু না। অবশ্য পৃথিবীর ওপরে, বায়ুমণ্ডল জুড়ে কয়েকশো উড়োজাহাজ একসঙ্গে উড়তে থাকলে তবেই এর কুফল স্পষ্ট হয়ে দেখা দেবে, তার আগে নয়। যেদিন সত্যিই এতোগুলো প্লেন একসাথে উড়বে, সে হবে ওযোন স্তরের পক্ষে দুর্দিন — হয়তো 2000 সালের অনেক আগেই।

জাপানের দুটি শহর হিরোশিমা ও নাগাসাকি ধ্বংস হয়েছিল আণবিক বোমায়। এই বোমার বিস্ফোরণে সৃষ্ট হয় প্রচুর পরিমাণ 'নাইট্রোজেন-অকসাইড' মিশ্র। বায়ুমণ্ডলের ওপরে উঠে গিয়ে এরা ওযোন স্তর পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে। বিজ্ঞানীদের চাপে এ ধরনের বিপদের সম্ভাবনা অনেক কমে গেছে। একমাত্র ফ্রান্স ও চীন বাদে প্রায় আর সব দেশই বায়ুমণ্ডলে আণবিক বিস্ফোরণের পরীক্ষা বন্ধ করে দিয়েছে।

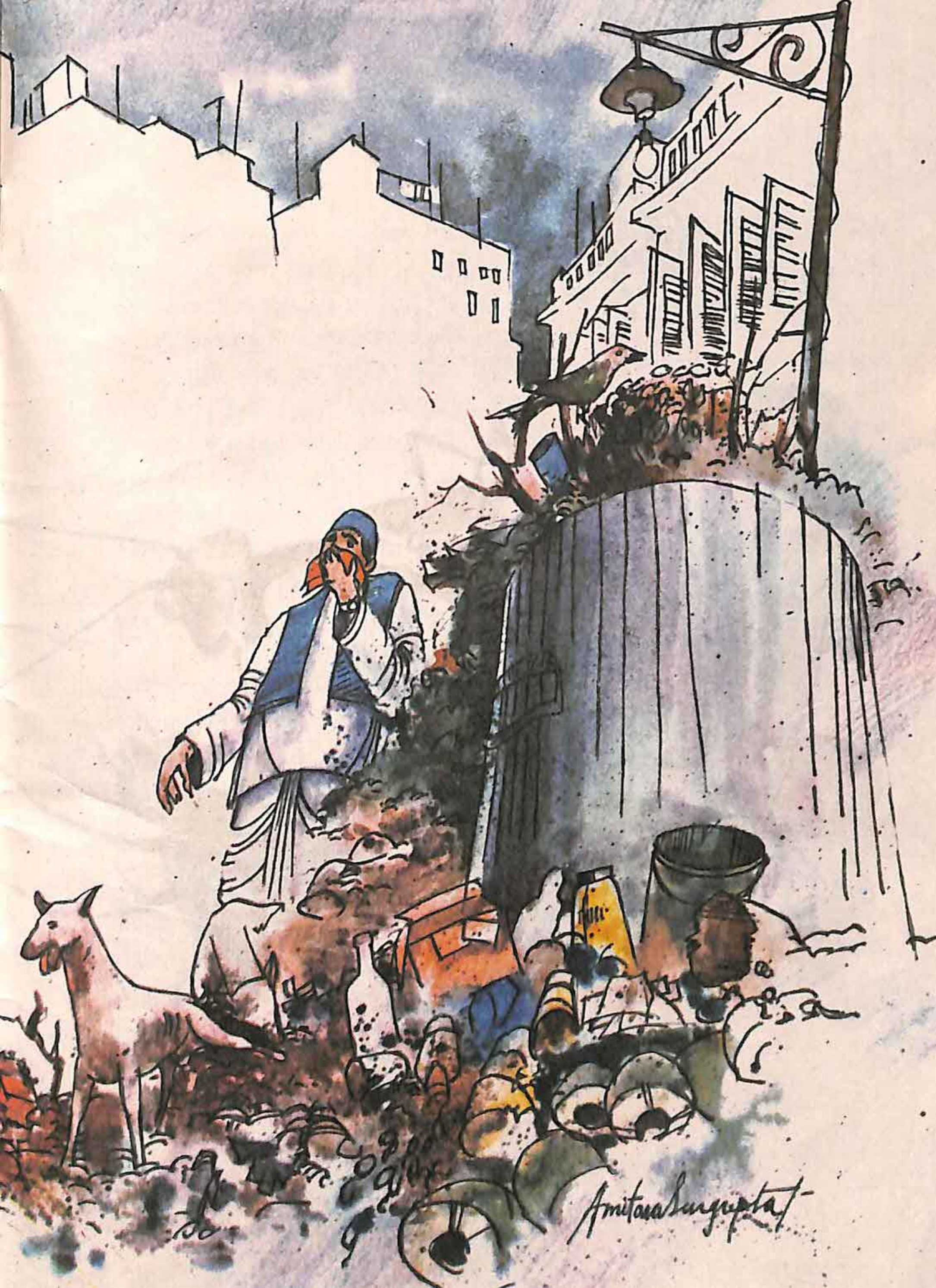
ওযোন স্তর এমনিতেই কমজোর। তার আরেক শত্রু : 'এয়ারোসোল' বা 'হাওয়াই পাত্র', যেমন — চুল রাঙানোর বা সেন্ট সুগন্ধি স্প্রে করার শিশি-কৌটো। এইসব পাত্রে সেন্ট বা রংয়ের সলিউশনের সঙ্গে থাকে 'ফ্লুওরো-কারবাইন' জাতীয় গ্যাস — যেটাকে উচ্চ চাপ দিয়ে ভরা হয়েছে ভেতরের ওই তরল পদার্থকে খুলিয়ে দেবার জন্যে। তরল পদার্থগুলি গ্যাসের মধ্যে কণা-কণা হয়ে ভাসতে থাকে। শিশি বা ডিবের ওপরে একটা বোতাম টিপলে দুটো মিশে গিয়ে তৈরি হয় 'এয়ারোসোল' যা টিউবের মুখ দিয়ে তোড়ে বেরিয়ে আসে। শুধু রং বা গন্ধ নয়, এই 'এয়ারোসোল স্প্রে' লাগানো আরও অসংখ্য জিনিস বাজারে ছাড়া হয়েছে। এই হাওয়াই পাত্রের ব্যবহার বন্ধের জন্যে বিজ্ঞানীরা আন্দোলন করছেন, খুব বেশি সাড়া পান নি।

তাঁরা আগামী দিনের পৃথিবীতে জীবনের নিরাপত্তার বিষয়ে উদ্বিগ্ন। কিন্তু ব্যবসায়ীরা বোঝে হাতেহাতে লাভ, ভবিষ্যতের ধার ধারে না। ওযোন-ঘাতী রাসায়নিকের জন্ম দেয় যেসব জিনিস, সেগুলো বন্ধ করতে তাই তাদের ঘোর আপত্তি। এতে যে ক্যানসারের মতো আরও অনেক রোগ বেড়ে যাবে, আগামী পনেরো-কুড়ি বছরের আগে তা হয়তো ধরা পড়বে না। কিন্তু ততদিনে, যখন আজকের ছেলেমেয়েরা মধ্যবয়সে পৌঁছে যাবে, আধির চেয়ে ব্যাধি হবে বড়ো।

জঞ্জালের পাহাড়

সুস্থভাবে বেঁচে থাকার পথে সবচেয়ে বড় বাধা — 'জঞ্জাল বা লক্কড়-দূষণ'। তোমরা কি জানো যে বর্তমানে, পৃথিবীর যতো মানুষ সবাই মিলে বছরে 10,000,000,000 টন এসব ফেলে থাকে? তার মধ্যে থাকে গোবরের মতো সামান্য জিনিস, আবার উন্নত বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তির ফসল নানা জটিল পদার্থ — প্লাসটিকের ডিবে, শিশিবোতল, কাগজ, পলিথিনের ব্যাগ, নাইলন, এমনকি ভাঙ্গাচোরা মোটরগাড়িও। সমুদ্রের সমতলে, এক কিলোমিটার জায়গা নিয়ে, এগুলো যদি চোঙার মতো জড়ো করা যায়, তার চূড়া এভারেস্ট পাহাড়কেও ছাড়িয়ে যাবে। অর্থাৎ আমরা বছর-বছর একটা করে 'জঞ্জালের এভারেস্ট' তৈরি করে চলেছি। তার প্রায় অর্ধেকটা গোবরগাছা, এক-তৃতীয়াংশ মতো শিল্প ও খনিজ আবর্জনা, বাদবাকিসব চাষের মাঠ, গৃহস্থবাড়ি, দোকানপাট, পথঘাট নালা-নর্দমার উচ্ছিষ্ট। জঞ্জাল সমস্যার চূড়ান্ত এখন য়ুরোপ-আমেরিকায় — বাতিল-গাড়ি নিয়ে যে কী করবে, ভেবেই কুল পাচ্ছে না ওরা। ভারতে যতো পরিবার সংখ্যায় প্রায়




Amitava Sengupta

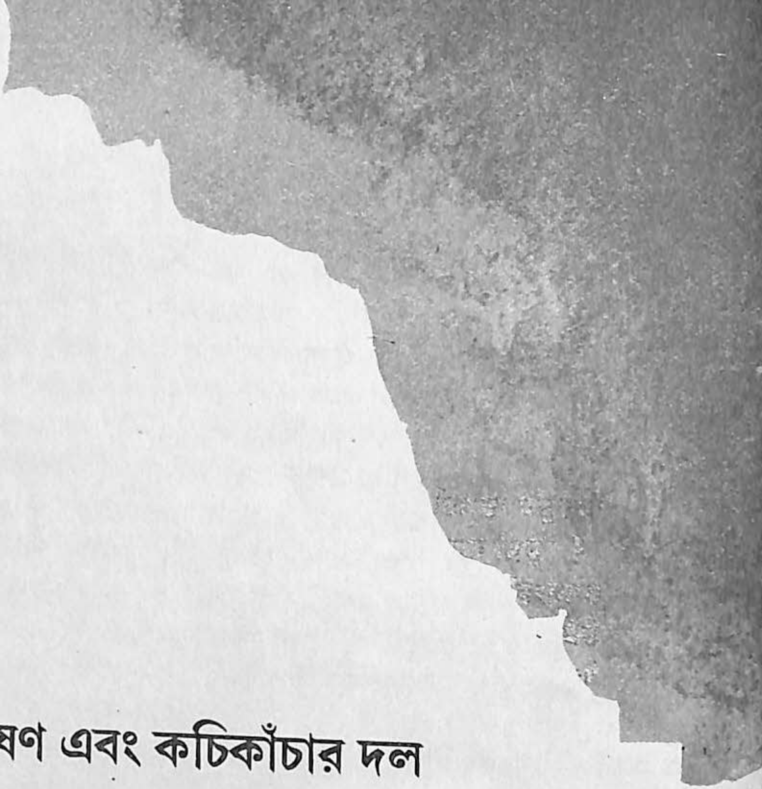


ততোগুলিই ভাঙ্গাচোরা হাড় বের করা ভ্যান-ট্রাক ইত্যাদি ডাঁই হয়ে পড়ে আছে উত্তর আমেরিকা ও য়ুরোপের যত্রতত্র — প্রকৃতির সবুজ দেহে বসন্তের গুটির মতো। আমাদের এই একদা সুন্দর উপগ্রহকে আমরা দিনদিন কুৎসিত থেকে কুৎসিততর করে তুলছি।

লোহালক্কড় বা জঞ্জাল এমন একটা গুরুতর সমস্যা কেন?

প্রথমত, প্রতি এক কিউবিক মিটার জঞ্জালে বাসা বাঁধতে পারে 750,000 মাছি; তার ওপর ছুঁচো-ইঁদুর-আরশোলা-মশারা তো আছেই। দ্বিতীয়ত, এইসব জঞ্জালের গাদা রোগবাহী জীবানুদের আদি জন্মস্থান। তৃতীয়ত, এরা প্রাকৃতিক ভূভাগকে, দৃশ্যকে কুৎসিত করে এবং আমাদের থাকার জায়গাকেও খেয়ে ফেলতে থাকে। এক একটা দিন যায়, আরও বেশি বেশি জঞ্জাল জমা হয়, যেগুলোকে সহজে নষ্ট করা যায় না। বিপদ ঘনিয়ে উঠছে আর তার জন্য দায়ী আজকের শিল্প-উদ্যোগ। বাজারে এখন সব জিনিসই প্লাসটিক ব্যাগে সুন্দর প্যাক-করা অবস্থায় পাওয়া যায়। ব্যবহারের পর, ব্যাগগুলো ফেলে দেওয়া হয়। কিংবা হয়তো অন্য কাজে কিছুদিন ব্যবহার করলে, দু-একটা ফুটো হলেই ফেলে দিলে — এইরকম 'ব্যবহার করো-তারপর-ফেলে দাও'-জাতীয় জিনিসের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে।

শহরের ময়লাফেলার গাড়ি কতো বিচিত্র রকমের টুকরোটাকরা উঠিয়ে নিয়ে যায়। তার মধ্যে দুর্গন্ধ ছড়ায় যেগুলো, তারা সবচেয়ে আগে রেহাই দেয়। সমস্যা হয় 'সিনথেটিক' বা নকল জিনিসগুলো নিয়ে, কোনমতেই খতম হতে চায় না। এদের তাই বলা হয় 'অবিনাশী'। মাটিতে যদি নাইলনের একটা রুমাল পুঁতে রাখো, কয়েক বছর পরেও দেখবে, ঠিক তেমনিই রয়েছে। নাইলন ও অন্যান্য সিনথেটিক সবই অবিনাশী। মাটির তলার জীবাণুরা মৃতদেহ খেয়ে বেঁচে থাকে কিন্তু সিনথেটিক ছোঁবে না। সারা পৃথিবী জুড়ে, প্রতি বছর, আমরা 150,000,000,000 কৌটো বা ডিব্বা, 80,000,000 টন শিশিবোতল এবং 150,000,000 টন কাগজ ও প্লাসটিক ফেলে ফেলে জঞ্জালের পাহাড়ের ওপর পাহাড় বানাচ্ছি। বিলিব্যবস্থা? — তার ভার ছেড়ে দিচ্ছি ভবিষ্যতের হাতে!

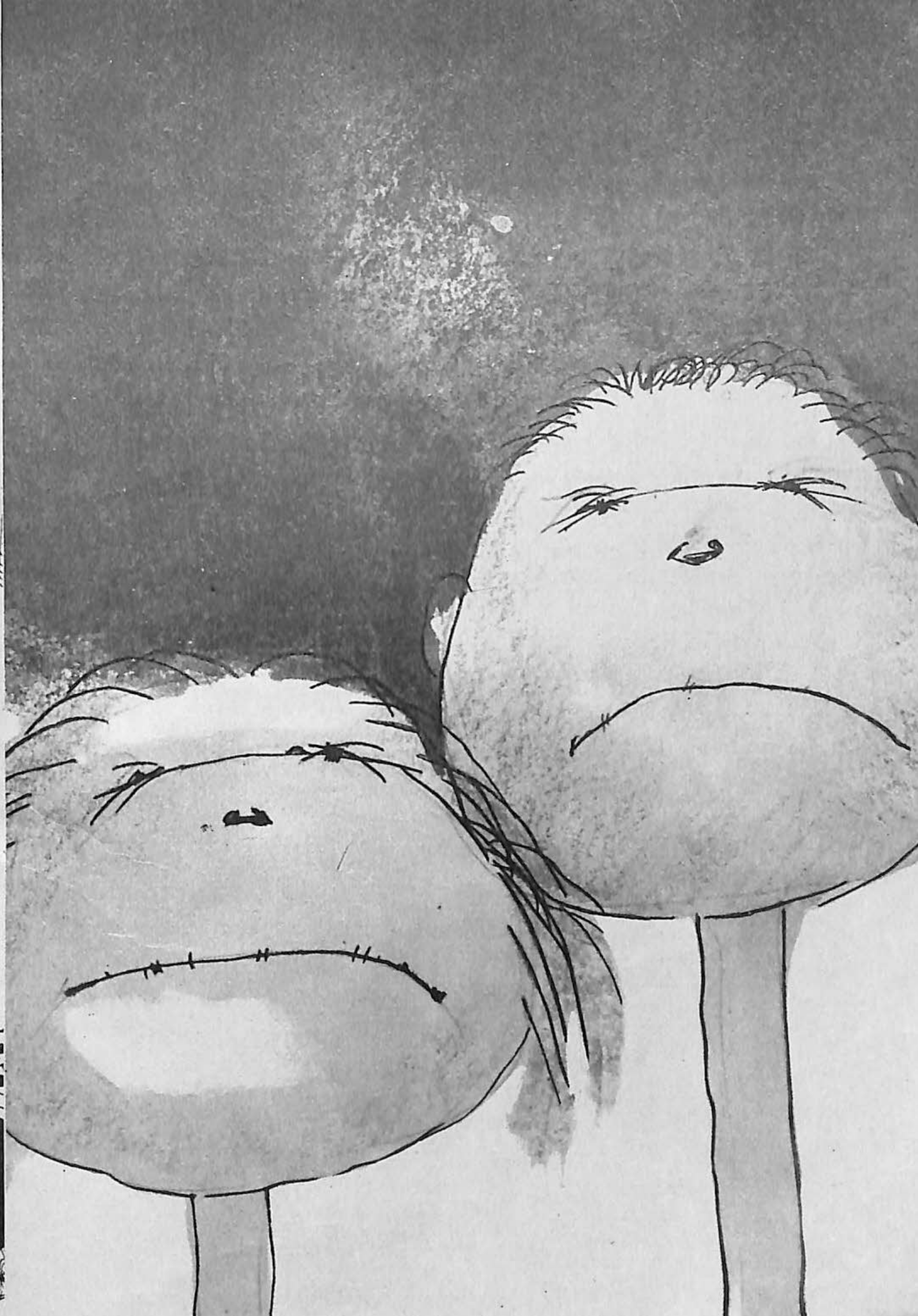


দূষণ এবং কচিকাঁচার দল

দূষণ কাহিনীর সবচেয়ে দুঃখের অংশ হল : বায়ু-দূষণের কুফল বড়দের চেয়ে ছোটদের স্বাস্থ্যের ওপরেই বেশি। কেন এমন হয় ?

বায়ুমণ্ডল থেকে বড়দের চেয়ে ছোটদের ফুসফুস বেশি বাতাস নেয় ও ছাড়ে। তার কারণ ওরা বেশি দৌড়ঝাঁপ করে। এবং ফুসফুসে বেশি বাতাস যাওয়া মানে, সেই অনুপাতে, বেশি দূষিত পদার্থও যাওয়া। বস্তুত, প্রতি এক কিলোগ্রাম দেহের ওজন পিছু বড়রা যে পরিমাণ দূষিত পদার্থ নাক দিয়ে নেয়, শিশুরা নেয় তার দু'গুণ !

তার ওপর, অনেক বায়ু-দূষক, যেমন সীসা, মাটি থেকে এক মিটার ওপরেই চলাফেরা করে, দু'মিটারও নয়। এর অর্থ : বড়রা লম্বা হওয়ায়, ওই বাতাসে শিশুরাই নিঃশ্বাস নেয়, দূষণ যেখানে বেশি। তার ওপর, খেলতে খেলতে ওরা যে ধুলো ওড়ায়, তাতেও থাকে দূষিত পদার্থ।



প্রায়ই, কচি কাঁচারা কমিক্‌স্‌-এর রঙীন পাতা কি রংচঙে পুতুল মুখে পুরে দেয়। এগুলোতে থাকে সীসা, যা ওদের অঙ্গে চলে যায়। ভিটামিন, প্রোটিন ও খনিজ উপাদানের ঘাটতি যে শরীরে সেখানে শিশু স্বাস্থ্যের ওপর সীসার প্রতিক্রিয়া সাংঘাতিক। এগুলো তখনই ঘটে যখন ওদের বাড়ের সময়।

বড়দের তুলনায় শিশুরাই কেন দূষণের সহজ শিকার, এগুলো তার কয়েকটা কারণ মাত্র।

দূষণ এখন যে পর্যায়ে রয়েছে, তাতে চোদ্দ বছরের নিচের কয়েক লক্ষ শিশুর স্বাস্থ্য হানির আশংকা। দূষণ যদি বাড়তেই থাকে, 2000 সালের মধ্যে আক্রান্ত শিশুর সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে কয়েক কোটিতে। তার আগেই, আর কয়েক দশকের মধ্যে, দেখা দিতে পারে একাধিক দীর্ঘস্থায়ী রোগ। দূষণ-কবলিত চোদ্দ বছরের কমবয়সী শিশুদের স্বাস্থ্যের হাল হবে 'চেইন-স্মোকার' তথা লাগাতার-ধূমপায়ীদের মতো — ঘরে ঘরে ব্রংকাইটিশ, বিকল স্নায়ুতন্ত্র।



এ ব্যাপারে যে শিল্পপতিরা অনেকখানি দায়ী, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে কয়েক বছর আগে আবিষ্কৃত একটা ঘটনা থেকে। জাপানের একটা কারখানা তার যতো পারা-আবর্জনা সব ঢেলে দিত মিনামাটা উপসাগরে। এই উপসাগরের মাছ যারা-যারা খেয়েছিল প্রত্যেকেরই একটা সাংঘাতিক রোগ হয়েছিল, যা এখন 'মিনামাটা ব্যাধি' বলে পরিচিত। এটা হচ্ছে স্নায়ুর একটা অদ্ভুত ব্যাধি। অনেকে মারা গেল, পঙ্গু হয়ে গেল অনেকে। বেশির ভাগই শিশু। এমনকি মায়ের পেটের বাচ্চারাও রেহাই পেল না। সবচেয়ে করুণ ব্যাপার হল, কারখানাটি উপসাগরের জলে এই বিষ ফেলে আসছিল দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে, বিপদের কথা কেউ ভাবে নি একবারও। এবং এটাই সবচেয়ে বড় বিপদ — আমাদের চারপাশে এতো বিষাক্ত পদার্থ, আমরা জানিই না। মিনামাটা রোগের কারণ যে রাসায়নিক দূষক, আমাদের আশপাশেই তারা রয়েছে, হয়তো কম মাত্রায়। কাগজ, রং, প্লাসটিক তৈরি করে এমন হাজার হাজার কারখানায় পারার ব্যবহার হয়। এইরকম সব আবর্জনা ভেসে বেড়ায় সেখানেই যে-বাতাসে আমরা নিঃশ্বাস নিই। অসম্ভব নয়, আমাদেরই মধ্যে কেউ কেউ ইতিমধ্যেই পারা-বিষে আক্রান্ত এবং তারা তা জানেও না।

বাতাসে ভাসমান যেসব রাসায়নিক পদার্থ শিশুদের মনের স্বাস্থ্যও নষ্ট করে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে সাংঘাতিক বোধহয়: সীসা। আগের এক অধ্যায়ে আমরা জেনেছি, মোটরগাড়ির ধোঁয়া থেকেও সীসার গুঁড়ো হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ে।



শব্দ-দূষণের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় শিশুদেরই। হিসেব নিয়ে দেখা গেছে, ব্রিটেনের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় লন্ডন বিমানবন্দরের কাছেই শিশুমৃত্যুর হার বেশি। ডাক্তারদের ধারণা, শব্দের জন্যেই হয়তো। সন্দেহ নেই, অত্যাধিক আওয়াজ কানকে জখম করে দেয়, তা থেকে মানসিক রোগও হতে পারে।

এমনও দেখা গেছে, বিষাক্ত পদার্থটি প্রথম যেখানে ফেলা বা ছোঁড়া হল, তার থেকে অনেক দূরে কোন জায়গায়, এমনকি অনেকদিন পরেও, তার ফলাফল ফুটে উঠল। সার হিসেবে আজ যে 'ঘনীভূত নাইট্রেট' মাঠে প্রয়োগ করা হচ্ছে, তারাই হয়তো কুড়ি বছর পরে দেখা দেবে আমাদের খাওয়ার জলে, কমজোর করে দেবে বাচ্চাদের রক্তের অকসিজেন-বহনের ক্ষমতাকে।

এখনও আমরা যথেষ্ট সচেতন নই যে, দূষণের বিরুদ্ধে কিছু না করার ফলে গোটা জাতটারই সুখ-স্বাস্থ্য সংকটের মুখোমুখি।



জুজুর সঙ্গে লড়াই

দুর্ভাগ্যের কথা, আমাদের এতদিনের জীবনযাপন প্রণালী ঠিক কি বেঠিক তা নিয়ে মাত্র ইদানীংই আমরা প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছি। একটা জাদুদন্ড ঘুরিয়ে যদি আমরা এই মাটি-জল-বাতাস দূষণের কুকর্মটিকে বন্ধ করতে পারতাম, পৃথিবীটা কতো সুস্থ ও সুখীই না হয়ে উঠত! কিন্তু এরকম কোন জাদুদন্ড তো নেই। দূষণ রুখতে হলে চাই সংকল্প ও অনুশাসন। আরও চাই সরকারী নিয়ন্ত্রণ এবং সংগঠিত প্রয়াস।

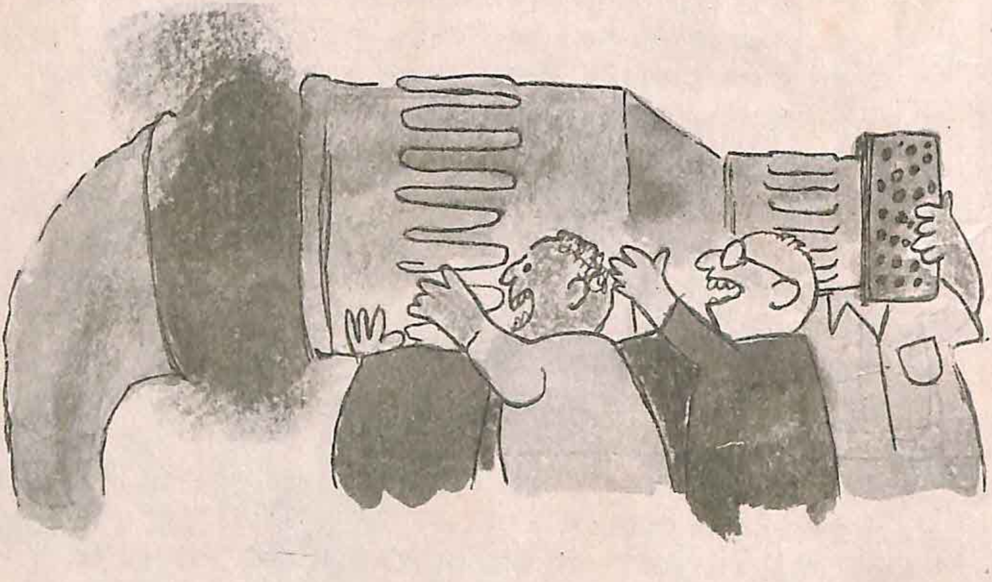
লন্ডনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত টেমস নদীর দৃষ্টান্তটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। 1950-এর কাছাকাছি নদীটি ভরে উঠল নোংরায় ও দুর্গন্ধে। গৃহস্থবাড়ির আবর্জনা এবং কলকারখানার বিষাক্ত রাসায়নিকে এমন বোঝাই হয়ে গেল যে জীবনধারণের অযোগ্য হয়ে উঠল। এক দশক পরে ক্ষতিটা যখন নজরে পড়ল, আইন করে নদীতে সব রকম আবর্জনা ফেলা বন্ধ করে দেওয়া হল। কিছুদিনের মধ্যেই জলে অকসিজেনের মাত্রা বেড়ে গেল, পলাতক মাছেদের যে-যার এলাকায় আবার দেখা মিলল।

দূষণের দুষমনির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সহায়তা দেবার জন্য আমরা দৈনন্দিন জীবনে কতকগুলো সহজ নিয়ম যেনে চলতে পারি — কী করব আর কী করব না। যেমন : কোন্ আবর্জনাটা অবিনাশী আর কোন্টা বিনাশী, আলাদা করে চিনতে শিখব। সব আবর্জনা আমরা ফেলব একমাত্র পৌরসভার দেওয়া ডাস্টবিনে। প্লাসটিকের ব্যাগ ও কাঁচের শিশিবোতলের মতো অবিনাশী বস্তুর ব্যবহার কমিয়ে দেব। যেসব সংস্থা এই ধরণের জিনিসপত্রকে 'রি-সাইক্‌ল্' অর্থাৎ অন্য জিনিসে রূপান্তরিত করে, তাদের আমরা সাহায্য

করব। যদি গাড়ী কিনি তো তাতে দূষণ-নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র যাতে লাগানো হয়, তা দেখব। আমাদের চাষীভাইরা বেপরোয়াভাবে কৃষি-আবর্জনা পোড়াতে পারবে না। হাওয়াই পাত্রের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করতে হবে।

আমাদের মূল লক্ষ্য হবে : ফেলে দেওয়া জিনিসকে নতুন রূপ দিয়ে তার পুনর্ব্যবহার, যতোটা সম্ভব কম আবর্জনা, এবং আমাদের পরিবেশের যে ক্ষতি আমরা ইতিমধ্যেই করেছি তার সংশোধন।

এ পৃথিবী আমাদের। এর দায়ও আমাদের। □





Printed at: Batra Art Press A-41 Naraina Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110028

মূল্য ঃ 6.50 টাকা

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

